গৌরকিশোর ঘোষ
শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিরঞ্জন হালদারের অন্যান্য বই

অর্থনীতি

কৃষি ও সমবায়

Studies in Modern Banking. (Fifth Edition). [co-author : Dr. Subratesh Ghosh]

সাহিত্য

সুধীন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মিলোভান জিলাস : মার্কসবাদ ও বর্তমান জগৎ

মুখোমুখি : সুধীন দত্ত ও এম. এন. রায়

(এ বছরের শেষে প্রকাশিত হবে।)

বিষয়সূচী

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ নিয়ে এই সঙ্কলন। বিষয়-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলি একটি মূল-বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা। সেই মূল-বিষয় হচ্ছে, ভারতের মতো গরিব ও জনবহুল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও পদ্ধতি। কৃষির উন্নতি ও শিল্প স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করলেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত ঠিক থাকবে, এ-কথা জোর করে বলা যায় না। কোন্‌টার উপর কতটা বেশী জোর দেওয়া হবে এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক কোন্ কর্মসূচী রচিত এবং তা কতটা কার্যকর হচ্ছে, তার উপরেই একটা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে। ভারতের উন্নয়নের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একদিকে যেমন গান্ধী ও মাও পদ্ধতি, তেমনি অপরদিকে ফেল'ডম্যান-মহলানবিশ মডেল, গ্রোথ পোলের ধারণা এবং ভারতের সরকারী অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

গান্ধী এবং মাও—দুজনেই এশিয়ান নেতা এবং ইউরোপীয় ও মারকিন চিন্তাধারা থেকে তাঁদের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা একেবারেই পৃথক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেই বৈশিষ্ট্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা আছে, তিনটি প্রবন্ধে। বইটিতে শিল্পের মালিকানা নিয়ে কোনো প্রবন্ধ নেই। কারণ শিল্পের মালিকানা নির্বিশেষে ধনতান্ত্রিক, আধা-সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে যে-সব সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে হয়, সেগুলিই আলোচনা করা হয়েছে। "কলকাতার সমস্যা ও সমাধান" প্রবন্ধে বৃহত্তর কলকাতা ও ভারতে শহর উন্নয়নের নতুন স্ট্র্যাটেজির কথাই কেবল বলা হয়নি, পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নৈতিক উন্নতি কী ভাবে হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে একটা রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। শহর উন্নয়নকে কী ভাবে দেশের সমগ্র উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তা একাধিক প্রবন্ধে আলোচিত।

"শিল্পনগরী ও আঞ্চলিক উন্নয়ন" প্রবন্ধটি প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থ ও যোজনামন্ত্রী ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় যোজনামন্ত্রী ডঃ শংকর ঘোষ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে একদিন ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট পশ্চিমবঙ্গের সঠিক উন্নয়নের

পদ্ধতি সম্পর্কে আমার মতামত শোনেন। কলকাতার বাইরে জেলা, মহকুমা ও বাজার শহরগুলিতে নতুন কর্মসংস্থান সম্ভাবনার কথা মনে রেখে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে বলি। মনে হয়, আমাদের সে-আলোচনার কিছু সফল ফলেছে।

রাতারাতি অনগ্রসর এলাকায় শিল্পোন্নয়ন ও উদ্যোগী শ্রেণী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা কেন সফল হচ্ছে না, "বাঙালীদের উদ্যোগী হওয়ার অসুবিধা" প্রবন্ধে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটা উন্নয়নশীল দেশকে অন্য কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা বইটির শেষ অংশে বৈদেশিক ঋণের সমস্যা, টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস, ডলারের পতন, রুপি-রুবল-স্টার্লিং প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যাবে। ভারত কোন্ পরিস্থিতিতে কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেটা বোঝাবার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা ভেবেও প্রবন্ধগুলির উপর কোনো কলম চালানো হয়নি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মারকিন ডলারের ডিভ্যালুয়েশান একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু বাংলা ভাষায় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-বিষয়ে "ডলারের পতন" ছাড়া আর কোনো প্রবন্ধ লেখা হয়নি। লেখাটা ঢাকার দৈনিক পূর্বদেশ-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এজন্য এটির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রবন্ধগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের সময় স্থানাভাবে কিছু কিছু লাইন বাদ দিতে হয়েছিল, বইটিতে সেই বাদ দেওয়া লাইনগুলি যোগ করা হয়েছে, কোনো কোনো প্রবন্ধ বড় না করে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। "রুপি-রুবল-স্টার্লিং" এবং "রুশ-বন্ধুত্বের দায়" প্রবন্ধ দুটি আইনগত কারণে বড় করা সম্ভব হয়নি। তাই অনেকগুলি দীর্ঘ পাদটীকা যোগ করা হয়েছে সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার জন্য। এই প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের পর কলকাতার রুশ-পন্থী একটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার আরম্ভ করে। ফলে আমি বাধ্য হয়ে "সপ্তাহ" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক অমিয় চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে দুটি মামলা দায়ের করি—একটি ফৌজদারি, অপরটি ক্ষতিপূরণের। আসামীদ্বয় ওই প্রবন্ধের জন্য তাঁদের উকিলের মাধ্যমে কলকাতার দশ নম্বর মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করে তা "সপ্তাহ" পত্রিকায় ছাপতে রাজী থাকার কথা বলেন। ওই ক্ষমা প্রার্থনা আমার মনঃপূত না হওয়ায় আদালত ওই ক্ষমা প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। এখন ফৌজদারি মামলাটি অন্যভাবে করার জন্য আসামীদ্বয়

হাইকোর্টের শরণ নিয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে লেখার ঝুঁকি কত বেশী, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

আমার বাংলায় অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লেখার সূত্রপাত শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের বারবার তাগিদের জন্য। এই বইয়ের বেশীরভাগ প্রবন্ধের বিষয় শ্রীঘোষের পরামর্শেই নির্ধারিত এবং প্রকাশও তাঁর তত্ত্বাবধানে। আশা করি, বইটি বর্তমানে অসুস্থ গৌরকিশোর ঘোষকে কিছুটা আনন্দ দিতে পারবে।

প্রবন্ধগুলি বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রাপ্য সজল বসুর। প্রেসে দেওয়ার দেড় মাসের মধ্যে বইটি বাজারে বের করা সহজ কথা নয়। বইটির নাম তাঁরই দেওয়া। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচ্ছদটি আঁকার জন্য আমি বিপুল গুহের নিকট ঋণী। প্রতাপ দত্ত, ডঃ কার্তিক শাসমল ও বিপ্লবকুমার দাস এবং প্রভাবতী প্রেসের সনাতন হাজরার সাহায্যও স্মরণীয়।

উন্নয়নের পদ্ধতি : গান্ধী বনাম মাও ?

১

সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতায় জন্য দেশবিদেশের অনেকেই গান্ধীজী প্রস্তাবিত পন্থার মধ্যে নতুন করে সমাধান খুঁজতে আরম্ভ করেছেন। একই সঙ্গে আর একদল লোক বিভিন্ন ব্যাপারে চীনের সাফল্যের ছবি তুলে ধরে এদেশে চীনা পদ্ধতি চালু করার কথা বলছেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে গান্ধীজীর মৃত্যু-দিবস উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে এই দুটো মতেরই প্রতিফলন দেখা গেল। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গান্ধী-পদ্ধতি একেবারে কাজে লাগানো হয়নি। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি নিয়ে বেশ কিছুকাল যাবৎ এদেশে ও বিদেশে চীনা কম্যুনিস্ট নেতা মাও সে-তুংকে গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। দুই নেতাই অ-ইউরোপীয় এবং এশিয়ার দুটি জনবহুল দেশের রাজনৈতিক মুক্তি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের ব্যাপারে নিজস্ব পদ্ধতিতে ভেবেছেন এবং নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা অনুসারে দুটি দেশকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তবে দুজনের মধ্যে তুলনার ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধা আছে। ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর মাও দেশ-গঠনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের চিন্তাধারার চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন ও এখনও দিচ্ছেন! আর গান্ধীজী দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই নিহত হন। ফলে গান্ধীজী প্রথম দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতি এবং শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে যে আদর্শ রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা ভেবেছেন, পরবর্তীকালে বৃহৎশিল্পকে অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করার পর আগের চিন্তাধারাকে নতুন করে সাজানোর সময় পাননি। ১৯৪০ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ রচিত অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুমোদন করে গান্ধীজী লেখেন, সমস্ত বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগত

মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং এজন্ত ভারী পরিবহণ, জাহাজ, খনি, ভারীশিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও গান্ধীজী কৃষি ও কুটিরশিল্পের উপর গুরুত্ব হ্রাস করেননি। স্বাধীন ভারত গান্ধীজীর গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-ভাবনাকে বরবাদ করলেও কম্যুনিস্ট চীনের কৃষি ও আঞ্চলিক উন্নয়নের কর্মসূচী গান্ধীজীর চিন্তাধারারই কাছাকাছি।

কম্যুনিস্টরা ভারীশিল্পের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মাও ভারীশিল্পকে 'মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র' বলে অভিহিত করলেও চীন কিন্তু রুশ বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির পন্থা অনুসরণ করেনি। চীনের বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করেই কৃষি ও হালকা শিল্পের উপরেই জোর দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে পলিটব্যুরোতে অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাও যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা পরে 'দি টেন গ্রেট রিলেশানশিপস' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেছিলেন, "হালকা শিল্প ও কৃষির বদলে ভারী-শিল্পের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে অনেক সমাজতন্ত্রী দেশ যে ভুল করেছে, আমরা তা এড়িয়ে গিয়েছি। বিপ্লবের পরে কয়েকটি দেশে বাজারে জিনিস-পত্রের অভাব দেখা দিয়েছিল, আমাদের এখানে তা হয়নি। বাজারে অনেক বেশি জিনিস পাওয়া যায় এবং তাদের দামও ওঠানামা করে না।···দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের উৎপাদন যত বাড়বে, মূলধনের সংগ্রহ তত বৃদ্ধি পাবে। হালকা শিল্প ও কৃষি অনেক বেশি ও অনেক দ্রুত মূলধন বাড়াতে পারবে।

"কৃষি সম্পর্কে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, সরকারী খামার চালু হওয়ার পরেও খারাপ পরিচালনব্যবস্থার জন্য উৎপাদন বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।···তারা চাষীদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছে এবং শিল্পজাতদ্রব্যের তুলনায় কৃষিপণ্যের দাম কম রেখেছে।··· আমাদের সরকারী মূলধন সংগ্রহের মাধ্যম হচ্ছে করব্যবস্থা, দামের কারচুপি নয়। শিল্পজাত দ্রব্য সম্পর্কে আমাদের নীতি হচ্ছে মুনাফার হার কম রাখা, বেশি বিক্রি ও দামের স্থায়িত্ব।"

মাও-এর উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটা জিনিস স্পষ্ট। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে রুশ ও পূর্ব ইউরোপে অনুসৃত ভারীশিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়ার নীতি তিনি বাতিল করেছেন। তিনি 'দি টেন গ্রেট রিলেশানশিপস'-

এ যে-সব কথা বলেছেন, ভারতে দ্বিতীয় যোজনার খসড়া ও মহলানবিশ মডেলের বিরোধিতা করে অনেক কম্যুনিস্ট বিরোধী; সমাজতন্ত্রী, র্যাডিক্যাল হিউমানিস্ট অর্থনীতিবিদ ওই সব কথাই বলেছিলেন। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে তথাকথিত রুশপন্থীদের সঙ্গে মাও-এর বিরোধিতার একটা বড় কারণ সম্ভবত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি নিয়ে। চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতির দিকে এদেশের নকশালপন্থী ও চীন-পন্থী অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি একেবারেই পড়েনি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে চীনের সাফল্যে মোহগ্রস্ত হয়ে তারা কেবল মাও'র 'বন্দুকের নল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস' শ্লোগান আউড়েছে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও মান উন্নয়নের পদ্ধতি নিয়ে একেবারেই চিন্তা করেনি। অনগ্রসর জনবহুল দেশের খাদ্য, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা বিবেচনা করে মাও-প্রস্তাবিত চীনা পদ্ধতি অনেকটা গান্ধী-প্রস্তাবিত পদ্ধতির কাছাকাছি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-ইউনিটের ধারণা মাও-এর নিকট গ্রহণযোগ্য না হলেও, চীন তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল আঞ্চলিক ইউনিট গঠনে উদ্যোগী হয়। ভারতের চীন-বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, চীনের খাদ্য আমদানির পরিমাণ ভারতের খাদ্য আমদানির পরিমাণের কাছাকাছি। দুটি দেশের শহর-এলাকায় যে বিপুল জনসংখ্যা বাস করে, গ্রামাঞ্চল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও, ওই জনসংখ্যার জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে ও হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন, ভারতেও চীনের মতো কৃষি ও হালকা শিল্পের উপর গুরুত্ব এবং কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম (পাট ও ধান-চাষীর মতো ঠকানো নয়) দিলে এবং গান্ধীজীর গ্রাম্য ইউনিটের ধারণাকে আঞ্চলিক ইউনিটে সম্প্রসারিত করলেই কি ভারতের অবস্থা চীনের সঙ্গে তুলনীয় হত? এই প্রশ্নের একমাত্র জবাব, না। কারণ, চীনা সমাজ প্রথম থেকেই সেকুলার হওয়ায় সেই সমাজের মানসিকতাকে নতুনভাবে পরিচালিত করা যত সহজ, ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত এবং নানা রকম সংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতীয়দের সেভাবে পরিচালিত করা তত কঠিন। দ্বিতীয়ত, চীনের মেয়েরা সর্বস্তরে কাজ করায় বাড়ির বাইরে কাজের লোকের সংখ্যা যেমন বাড়ে, তেমনি তারা পরিবারের রোজগার বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে থাকে। কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার ছাড়া এদেশে যে-সব পরিবারের মেয়েরা কায়িকশ্রমের কাজ করে,

আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভালো হলে বা লেখাপড়া শিখলে ঘরের বাইরের কাজে তাদের বড় একটা দেখা যায় না। তৃতীয়ত, অন্য কাজে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকায় জমির উপর চাপ কম পড়ে এবং তখন কম লোকে বেশি উৎপাদন করতে পারে। চতুর্থত, চীনাদের খাদ্যাভ্যাস খাদ্যসমস্যার সমাধান ও কোনও এলাকাকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করার সহায়ক। তারা খায় না, এমন জিনিস খুবই কম আছে। শুকরের মাংস তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী। শূকরের মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি, শূকরের চর্বি খাদ্যে ফ্যাট এবং খাবারের তেলের সমাধান করে থাকে। শূকরের মাংসের স্যুপের জন্য চাল বা গম বেশি দরকার হয় না। তরিতরকারির খোসা এদেশে ফেলে দেওয়া হয়, চীনাদের স্যুপে তা খাদ্যগুণ বাড়ায়। শূকর পালনে খরচ কম এবং শূকর ও মানুষের বিষ্ঠা চীনে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সয়াবিন শহরে-গ্রামে গরু-মহিষের দুধের অভাব পূরণ করে, এবং সাধারণ মানুষের খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। কেবল চীন নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভিন্ন ধরনের খাদ্যাভ্যাসের জন্য খাদ্যের ব্যাপারে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ভারতের মতো প্রকট নয়। গুনার মিরডালও তাঁর "এশিয়ান ড্রামা" গ্রন্থে এই পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

এদেশের ও বাংলাদেশের চীন-ভক্তরা কিন্তু চীনের মতো মেয়েদের বাড়ির বাইরের কাজে লাগানো এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মতো কর্মসূচীকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি। ভারতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে চাল ও গমের চাহিদা বেড়ে যায়। এই খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন না হলে ভারতের খাদ্য-ঘাটতি কোনও দিনই দূর হবে না। চীনাদের মানসিকতাও তাদের কর্মক্ষম করে রাখে। প্রথম থেকেই ঈশ্বর ও দেবদেবীতে বিশ্বাসহীন চীনাদের মানসিকতা ভারতীয়দের মতো অদৃষ্টবাদী নয়। এজন্যই তারা অনেক ভারতীয়ের চেয়ে কর্মক্ষম। বিশেষ মানসিকতা, খাদ্যাভ্যাস ও সমাজে নারীদের ভূমিকার জন্য এশিয়ার অপর দুটি চীনা-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের জীবনযাত্রার মানও অনেক উঁচুতে। গান্ধীজী এদেশে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে-সব আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য দল তো বটেই, এমন কী গান্ধীবাদীরাও রাষ্ট্র-কাঠামো পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন, অজস্র সংস্কার ও বন্ধন-দশা থেকে মেয়েদের মুক্ত করার সমস্যা

অবহেলিত থেকেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম হতে পারে না, গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও গ্রামকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। তবে গান্ধীজী-প্রস্তাবিত কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব দিলে অন্ততঃ কৃষি ও গ্রামের গরিবদের অবস্থার উন্নতির দিকে আর একটু বেশী দৃষ্টি পড়ত এবং তখন গ্রামে কৃষি ছাড়া অন্য কাজে আরও বেশি লোক নিয়োগ করা সম্ভব হত, গান্ধীজী প্রস্তাবিত কর্মসূচীর অপ্রয়োজনীয় অংশও বাতিল হয়ে যেত। চীন কম্যুনিস্ট হয়েও জনবহুল ও অনগ্রসর দেশের উন্নতির জন্য রুশ-মডেলকে বাতিল করেছে আর ভারত ভিন্ন পরিবেশে রুশ-মডেল চালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দুই দেশের ভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন-পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্যই দুই দেশে দু রকম অবস্থার প্রধান কারণ।

[আনন্দবাজার পত্রিকা। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫।]

শিল্পনগরী ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ২

পশ্চিমবঙ্গ ও সেই সঙ্গে কলকাতার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বেশ কিছুকাল যাবৎ দুটো মজার শ্লোগান শোনা যাচ্ছে। এক, বৃহত্তর কলকাতায় জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য দুর্গাপুর, আসানসোল, হলদিয়া, শিলিগুড়ি ও সাঁওতালদি-কে কলকাতার কাউন্টার ম্যাগনেট হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এগুলি হবে গ্রোথ-সেন্টার। অর্থাৎ কলকাতার বদলে ওই কেন্দ্রগুলিতেই কাজের ব্যবস্থা হবে, এবং তার ফলে লোকে আর মহানগরীতে এসে ভিড় করবে না। রাজ্য-যোজনা পর্ষদ্ পঞ্চম যোজনাকালে ওই পাচটি স্থানকে গ্রোথ সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। (যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের টাউন অ্যাণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অর্গানিজেশানের পুস্তিকায় জল সরবরাহের সমস্যা দুর্গাপুর-আসানসোল-চিত্তরঞ্জন এলাকায় নতুন শিল্পস্থাপনের প্রতিবন্ধক বলে উল্লেখ করা হয়েছে) রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ শংকর ঘোষও ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। অপর শ্লোগানটি হল, রাজ্যের বর্তমান দুর্গতি দূর করতে হলে শহর উন্নয়নের বদলে কৃষির উপর জোর দিতে হবে। প্রথম শ্লোগানটি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

স্থানীয় লোক ও রাজ্যের অধিবাসীরা ভেবে থাকেন, তাঁদের এলাকায় ও রাজ্যে কোনও বড় শিল্প স্থাপিত হলে তাঁরা সেখানে কাজ পাবেন এবং নতুন শিল্পনগরীর আশেপাশেও শিল্পোন্নয়নের সুফল ছড়িয়ে পড়বে। গ্রোথ সেন্টার থিয়োরিরও এটা মূল কথা। ঠিক এ-কারণেই অনগ্রসর এলাকায় বড় বড় কারখানা স্থাপনের জন্য আন্দোলন হয়, কেন্দ্রীয় সরকারও ওই জাতীয় অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। গ্রোথ সেণ্টার স্থাপনের যুক্তিতেই দুর্গাপুর, ভিলাই, বোকারোতে ইস্পাত কারখানা, বারুণী ও হলদিয়ায় তেল-শোধনাগার ও সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক দুর্গাপুর ছাড়া অন্যত্র স্থানীয় লোকেরা কল-কারখানায় তেমন কাজ পায়নি। গ্রোথ সেণ্টারের ধারণা অনুসারে আশেপাশে চারিদিকে

২০-২৫ মাইলের মধ্যে শিল্পোন্নয়নের সুফল ছড়িয়ে পড়েনি, শিল্পনগরীর বাজারের কথা ভেবে গোটা এলাকায় কৃষিজাত দ্রব্যেরও উৎপাদন বাড়েনি। অনগ্রসর অঞ্চলের শিল্পনগরীতে স্থানীয় লোকেরা কাজ পায় না। কিন্তু কেন? কল-কারখানা ও শোধনাগারের কাজে প্রধানত ৬-৭ ধরনের লোক দরকার হয়। কোনও অনগ্রসর এলাকা ম্যানেজমেণ্টের লোক বা ইঞ্জিনীয়ার সরবরাহ করতে পারে না। সেখানে কোনও টেকনিক্যাল স্কুলও থাকে না যে, স্থানীয় যুবকেরা দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করবে। কিছু লেখাপড়া শিখলে আধা-দক্ষ শ্রমিকের কাজ মিলতে পারে, কিন্তু অনগ্রসর এলাকায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ খুব কম লোকই পায়। কেরানীর চাহিদাও তারা পূরণ করতে পারে না। দারোয়ান, শিল্প-নিরাপত্তা বাহিনী বা বেয়ারার কাজে নিযুক্ত হতে হলেও কিছু ট্রেনিং বা শিক্ষা দরকার। তাই অদক্ষ কাজেও নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা সকলের থাকে না। ঠিক এই কারণেই কোনো শিল্পনগরীর কল-কারখানায় সেই এলাকার বাস্তুচ্যুত অধিবাসীরা কাজ পায় না। তারা বড় জোর মাটি কাটা বা বাড়ি তৈরির জোগানের কাজ বা পরে কারখানায় কুলির কাজ পায়। এজন্য গ্রোথ সেণ্টার হলেই সেখানকার অধিবাসীদের স্থানীয় প্রকল্পে কাজ পাওয়ার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য তারা কাজ পেতে পারে, যদি প্রথম থেকেই ওই অনগ্রসর এলাকায় ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের কথা মনে রেখে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য আগেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, এবং বিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করা যায়। কিন্তু এসব কথা ভাববার সময় শাসক বা বিরোধী দলের নেতাদের নেই, যোজনা কমিশন বা রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্যদের মাথায়ও আসেনি। কারণ ফরাসী দেশে বা পরে আমেরিকায় গ্রোথ সেণ্টারগুলিতে এ-জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

এদেশে শিল্পনগরী বা উপনগরীগুলি গ্রোথ সেণ্টার হিসাবে গড়ে ওঠেনি প্রধানত দুটি কারণে। এক, শিল্পনগরীতে কারখানা বা শোধনাগার কাজের অন্যতম তো বটেই, একমাত্র উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে। দুই, শিল্পনগরীগুলিকে এক একটা দ্বীপ হিসাবে বজায় রাখা হয়েছে। শিল্প-এলাকার কাঁচামাল ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আসে দূরাঞ্চল থেকে—রেলে অথবা সড়কে। শিল্পদ্রব্যও বিক্রি হয় একইভাবে। শিল্পনগরীকে আশেপাশের এলাকার সঙ্গে রাস্তাঘাট, যোগাযোগব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে যুক্ত করা হয়নি।

প্রথম কারণটির অতিরিক্ত প্রাধান্যের জন্য দ্বিতীয় কারণটি দূর করার চেষ্টা হয়নি। তাই দুর্গাপুর এলাকায় জি-টি রোডই কার্যত একমাত্র পাকা সড়ক। বিভিন্ন দিকে গ্রামগুলিকে সোজাসুজি শিল্পনগরীর সঙ্গে যুক্ত করার কোন পাকা রাস্তা নেই। জি-টি রোড থেকেও দুইদিকের হাট-বাজার ও গ্রামগুলিকে যুক্ত করার তেমন পাকা ফীডার রোড নেই। হলদিয়ায় কয়েক শো কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে,কিন্তু হলদি নদীর অপর পারে অবস্থিত নন্দীগ্রামের সঙ্গে পারাপারের কোনও সরকারী ব্যবস্থা নেই, নন্দীগ্রামের দিকে এজন্য কোনো পাকা সড়কও তৈরি হচ্ছে না। কাঁচা রাস্তায় পৌঁছাতে হলেও গ্রামবাসীদের মাঠের আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। এ পারেও নতুন রাস্তা হচ্ছে না, সঙ্কীর্ণ রাস্তাটাও চওড়া করা হয়নি, ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করারও তাগিদ নেই, ওইসব রাস্তা থেকে আশেপাশের গ্রাম ও হাট-বাজারকে যুক্ত করার মতো পাকা ফীডার রোড তো নয়ই। কল্যাণী উপনগরী স্থাপিত হয়েছে অনেক বছর আগে। কিন্তু আজও কল্যাণী থেকে আশেপাশের গ্রামে যাওয়ার রাস্তা নেই। কল্যাণী-বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, অথচ মাঝেরচর, চরসরাটি প্রভৃতি পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। বোকারো উপনগরীকেও সড়ক-পথে চারিপাশের গ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। সব উপনগরীতে এই একই চিত্র দেখা যাবে। ফলে এইসব শহরে সব জিনিসেরই দাম বেশী—আনাজ, কলা, মাছ, ডিম, মাংসেরও। দুধ তো দুষ্প্রাপ্য!

প্রতিটি শিল্পনগরীতে অজস্র ছোটখাটো দোকান আছে। কিন্তু সেইসব দোকানের চাহিদা মেটানোর জন্য কর্তৃপক্ষ কোনও পাইকারী-বাজার স্থাপনে উদ্যোগী হননি। শিল্পনগরীর সঙ্গে এলাকার বিভিন্ন দিকের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে ওটি একটা বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত হতে পারত এবং বড় ব্যবসা-কেন্দ্র হলেই কাঁচামাল ও শিল্পজাতদ্রব্যের কেনাবেচার ব্যবস্থা চালু হবে। তখন শিল্পনগরী ও তার আশেপাশে গ্রামগুলিতে অজস্র ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে উঠতে পারে। আবার যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হলেই উপনগরীতে তরিতরকারি, ফলমূল, ডিম, মুরগী, অন্য মাংস, দুধ প্রভৃতি সরবরাহ করে চারিপাশের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হতে পারত, পরিবহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থানের জন্য জমির উপর চাপ হ্রাস পেত। গ্রামগুলি শিল্পনগরীকে প্রয়োজনীয় তরিতরকারি, দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি সরবরাহ করতে পারবে

কিনা, তা নির্ভর করে রাস্তাঘাট ও পরিবহণের সঙ্গে শিল্পনগরীতে গরু ও মুরগীর খাদ্য বিক্রি, পশু রোগ চিকিৎসা, সার সরবরাহ, সেচের পাম্প এবং স্পেয়ার মেরামত প্রভৃতি ব্যবস্থার উপর। শিল্পনগরীর চারিদিকে নতুন নতুন বাজার ও বাড়ি তৈরির জন্য সরকার থেকে শিল্পনগরীতে সিমেন্ট, লোহা, প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিল্পনগরীতে আশেপাশের গ্রামগুলির অধিবাসীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা-ব্যবস্থাও চালু করা প্রযোজন। কোনো উপনগরীকে গ্রোথ সেন্টারে পরিণত করতে হলেএইসব সমস্যার কথা মনে রেখে আঞ্চলিক পরিকল্পনা তো চাই-ই, সেই সঙ্গে চাই পূর্ত, কৃষি, পশুপালন, সরবরাহ, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শহর-উন্নয়ন, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব, পুলিস এবং কেন্দ্রীয় রেল-দপ্তরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও মিলিত কর্মসূচী। আসানসোল-দুর্গাপুর এলাকায আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা আছে, কিন্তু এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করার লোক সেখানে আগেও ছিল না, এখনও নেই। ফলে দুর্গাপুরের দশমাইল দূরে অবস্থিত গ্রামে কৃষকের অবস্থা ঠিক আগের মতোই রযে গিয়েছে। রাস্তাঘাট তৈরিব ব্যাপারে সরকার সর্বদা জমি দখলের অসুবিধার যুক্তি দেখান। সরকার রাস্তা তৈরির নামে ঠিকাদারের পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবেন, অথচ কৃষককে দেবেন নামমাত্র ক্ষতিপূরণ।

শিল্পনগরীকে আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পাইকারী কেন্দ্রে এবং পরিবহণ সংস্থার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করাব সাধাও অনেক। উপনগরীর সামগ্রিক পরিকল্পনা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। কিন্তু উপনগরীর বিভিন্ন শিল্পসংস্থা নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের মতো করে উন্নয়ন কর্মসূচী রচনা করেন এবং তারা নিজেরাই ঠিকাদারদের কাজ দেন। বিভিন্ন সংস্থা ঠিকাদার-দের পৃথকভাকে কাজ দেওযাব সুযোগ ছাড়তে অনিচ্ছুক। তাই প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করছেন। তাতে খরচ বেশী পডছে অথচ শিল্প-নগরীটি আঞ্চলিক কর্মসংস্থানের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে গ্রোথ পোল স্থাপন করে যেভাবে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা হয়েছিল, সব দিক থেকে অনগ্রসর ভারতে তা সম্ভব নয়। কল্যাণী, দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা, বোকারোয় তা প্রমাণিত হয়েছে, হলদিয়াতেও তা প্রমাণ হচ্ছে। রাজ্য যোজনা পর্ষদ বা অর্থমন্ত্রী ডঃ শংকর ঘোষ যদি ওই বিদেশী কনসেপ্ট আঁকডে না থেকে আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন, তা হলেই পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা বাঁচবে।

[আনন্দবাজার পত্রিকা। ৭ জানুয়ারি, ১৯৭৫]

আমাদের দুর্গতি ও কেতাবী প্লানার ৩

ভারত দুর্যোগ কাটিয়ে উঠেছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই জাতীয় উক্তির পরেই ভারত তেলের সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছে। "গরিবী" হটে যাওয়ার বদলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের গরিবরাই আজ নিঃশেষ হতে চলেছে। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসকে ভাগ করার পর শ্রীমতী গান্ধী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের দলের ক্ষমতা যেভাবে সুসংহত করেছিলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে যে-ভাবে তিনি পাকিস্তান ও আমেরিকার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন, উপমহাদেশের মানচিত্র যেভাবে নতুনভাবে আঁকতে সাহায্য করেছিলেন, তাতে দেশের কোটি কোটি লোক আশা করছিল যে প্রধানমন্ত্রী ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করতে পারবেন। দেশবাসীর সে-আশা পূরণ হয়নি।

গত কয়েক বছর যাবৎ যে সব বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক শ্লোগান ব্যবহার করে রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হবার কথা ভাবা হয়েছিল, সেই শ্লোগানগুলিই অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে কাল হয়েছে। ওই শ্লোগানগুলি কার্যকর করতে গিয়ে বিভিন্ন সোশালিস্ট ও কম্যুনিস্ট দেশ কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, শ্লোগানদাতাদের তা জানা ছিল না। কারণ এদেশের অনেক কম্যুনিস্ট নেতা ও কম্যুনিস্ট অর্থনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীরা কম্যুনিস্ট বা সোশালিস্ট হন ইংলণ্ড, আমেরিকা, হলাণ্ড বা ফ্রান্সের মতো ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গিয়ে, অ-ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে তাঁদের কোনো বাস্তব ধারণা বা অভিজ্ঞতা নেই। কয়লা খনি জাতীয়করণ করলে হাঙ্গেরিতেও যে প্রথম পর্যায়ে কয়লা পাওয়া যায়নি, রাশিয়াতেও যে নিয়ন্ত্রিত-দামে জিনিস বিক্রির দোকানের সঙ্গে কালোবাজারের দামে জিনিস বিক্রির জন্য আইনসঙ্গত কোলখোজ মারকেট ছিল, এ-কথা জানলেও তাঁরা তা স্বীকার করতে রাজী হননি। অপর দিকে রাশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে পড়াশুনা বা কাজের জন্য যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা কেউ কম্যুনিস্ট হয়ে ফেরেননি। কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী বা অর্থনীতিবিদ লণ্ডন, কেমব্রিজ

দেশ, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বা এম-আই-টিতে পড়াশুনো বা গবেষণা করলেও ওই সব দেশের অর্থনীতিও তাঁরা ভালভাবে জানেন না। তাই ওই সব বামপন্থী অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে আমরা কখনও জানতে পারি না এদেশে কী করলে হল্যাণ্ডের মতো সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, একজন মারকিন নাগরিক আয়কর ফাঁকি দিলে বা সুইৎজারল্যাণ্ডে তাঁর গোপনে টাকা জমা রাখার খবর জানাজানি হলে কী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এঁরা বিদেশে বসেই ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে অঙ্ক কষে প্রবন্ধ বা বই লেখেন। সত্যিকথা বলতে কী, ধনতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট কোন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেই এঁদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

শ্লোগান-সর্বস্ব বলেই ব্যাংক জাতীয়করণের দাবি উঠেছিল, জাতীয়করণের পর কীভাবে চলবে, তা নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যথা ছিল না। কয়লাখনি জাতীয়করণ করাই একমাত্র কাজ মনে হয়েছিল শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার প্রাক্তন কম্যুনিস্ট সদস্য মোহন কুমারমঙ্গলমের। কয়লাখনি জাতীয়করণের পর কী ভাবে তা চলবে, লোকে ন্যায্য দামে আগের মতো কয়লা পাবে কিনা, খনিতে শ্রমিকদের তালিকা বাড়ানো বন্ধ এবং কয়লার পারমিট দেওয়ার অফিসে বা লরি ও ওয়াগনে কয়লা বোঝাইয়ের সময় দুর্নীতি কী ভাবে বন্ধ করা যাবে, মোহনকুমার মঙ্গলমের কোনো লেখাতেই তার কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর বাড়িতে গ্যাসে রান্না হয়। তাই গৃহস্থের বাড়িতে কয়লার গুরুত্ব তিনি বোঝেননি। ইস্পাতের ব্যাপারেও তিনি একই দুর্যোগের কারণ হয়েছেন। এঁদের চিন্তার জড়তার একটা কারণ এঁরা মার্কসের বই থেকে নতুন সমাজ গঠনের প্রেরণা চান। কিন্তু মার্কস তো ধনতন্ত্রের অর্থনীতিবিদ এবং তাঁর ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণও প্রধানত ইংলণ্ডের ধনতন্ত্রকে কেন্দ্র করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ভাঙ্গাই মার্কসের একমাত্র চিন্তা ছিল। ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের কর্মসূচী নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি, বরং এ-ব্যাপারে রবার্ট ওয়েনের প্রচেষ্টাকে তিনি "ইউটোপিয়া" আখ্যা দিয়েছিলেন।

সব কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক নেতা, অর্থনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবী কংগ্রেসে যোগ দেননি, শ্রীমতী গান্ধী অনেককে ডেকে নিয়ে নিজের দপ্তরের পরামর্শদাতা বা যোজনা কমিশনের সদস্য নিয়োগ করেছিলেন। কংগ্রেস গনতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু যাদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাস নেই, দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যারা অজ্ঞ এবং দেশের কোন্ সমস্যা অগ্রাধিকার

পাওয়া উচিত জানা নেই, এমন লোকদের উপর অর্থ নৈতিক কাঠামো বদলাবার ভার দিলে যা হয়, তাই-ই হয়েছে। ১৯৬৭ সালে যিনি বলেন, দেশে কর-ব্যবস্থা না বদলালে কৃষি-উৎপাদন বাড়বে না, পরের বছর পাঞ্জাব-হরিয়ানায় সবুজ বিপ্লব দেখে তিনি কিন্তু নিজের ভুল-চিন্তা শুধরে নিলেন না। সবুজ বিপ্লব হলে রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ কীভাবে বেড়ে যাবে, তারই এক কাল্পনিক চিত্র ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন। সবুজ বিপ্লবকে সারা ভারতে কী ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, কী ভাবে কম দামে সারের পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা বা কী ভাবে জমিতে আরও জলের ব্যবস্থা করা যায় কিংবা মফস্বলে নতুন নতুন শহর ও বাজার সৃষ্টি করে ব্যবসা-বাণিজ্যে, পরিবহণে আরও কত নতুন লোকের কাজের ব্যবস্থা করা যায়—এসব যাঁর মাথায় একেবারেই ছিল না, এমন বিপ্লবী কম্যুনিস্ট যদি ভারত সরকারের অর্থ-দপ্তরের প্রধান পরামর্শদাতা হন, তাহলে দোষ তাঁরই, যিনি নিয়োগপত্র দেন। একই ব্যাপার ঘটেছে শিল্পের ক্ষেত্রে। বৃহৎ শিল্প সংস্থা বাড়ছে বলে দেশের মধ্যে নতুন নতুন সার, সিমেন্ট ও অন্যান্য কারখানা স্থাপন করতে দেওয়া হয়নি, সরকার নিজেও তেমন উদ্যোগী হননি। দেশে কারখানা হলে দেশেই পয়সা থাকে, কর্মীর সংখ্যাও বাড়ে। এদেশে মনোপলি আটকাবার নাম করে তাঁরা কিন্তু ভারতের পয়সা মার্কিন, জাপানী, ফরাসী, ইতালীয়দের পকেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে বিদেশে প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে বলেই সরকার এখন বৃহৎ শিল্পপতিদের নিত্য নতুন কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিচ্ছেন। সরকার ইচ্ছে করলেই কারখানা হাতে নিতে পারেন জানা সত্ত্বেও দেশী মনোপলিস্টদের শায়েস্তা করার নামে এদেশে শিল্প স্থাপনের অনুমতি না দিয়ে বিদেশী মনোপলিস্টদের পকেট ভারী করা হয়েছে।

রাশিয়ার মডেলে আজও এদেশে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলেছে। দ্বিতীয় পঞ্চম যোজনাকালে এদেশে "মহলানবিশ মডেল" নামে যা চালু হয়, ডোমারের কল্যাণে আমরা জানলাম সেটি রুশ অর্থনীতিবিদ ফেলড্‌মানের গ্রোথ মডেলের রকমফের। ডোমার বলেছেন, তিরিশ দশকে রুশ অর্থনীতি কী ভাবে চলছিল, ফেলডম্যান তারই ভিত্তিতে ওই মডেল রচনা করেন। ডোমারের মতে, ত্রিশ দশকে রুশ অর্থনীতি বুঝতেও ওই মডেলটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অথচ বিপ্লবের আগে রাশিয়ার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ইউরোপের চাহিদা মেটাত, উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য দেশের যাতায়াতব্যবস্থা অনেক উন্নত ছিল, ছিল

ফসল মজুত করার ব্যবস্থা। ১৮৯৮ সালে রাশিয়ার কেরোসিন ইন্দোনেশিয়ায় বিক্রি হয়েছে। এ-তুটোতেই ভারত ঘাটতি দেশ। মহলানবিশ মডেল চালু করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট তীব্র হয়ে দেখা দিলে সেদিন ডঃ মহলানবিশের কোনো কথা শোনা যায়নি।

বিদেশী বিশ্ববিত্মালয় বা বিদেশী অর্থনীতিবিদদের সারটিফিকেটের প্রতি অনেকের মতো সরকারী কর্ণধারদের মোহ খুবই বেশী। যাঁরা ওইসব সারটিফিকেট দেন, তাঁরা কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নন। লিয়নটিয়েফ মার্কিন অর্থনীতির পরিসংখ্যান ব্যবহার করে তাঁর ইনপুট আউটপুট অ্যানালিসিসের মাধ্যমে মার্কিন অর্থনীতি বিশ্লেষণ করেছিলেন। এদেশে লিয়নটিয়েফের নাম করে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন না, অ্যালজ্যাবরা দিয়ে অঙ্ক কষে বাহবা কুড়ান। এমন লোককে যোজনা কমিশনের সদস্য করার পরিণতি এই হয়েছে যে, এই সরকারী অর্থনীতিবিদরা দেশের অর্থনীতিবিদদের এড়িয়ে চলেন। যোজনা কমিশনকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এদেশে একটি ইকনমিস্টস প্যানেল আছে। ২১ মাস বাদে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে প্যানেলের বৈঠক ডাকা হয়, তা ও কী কী বিষয়ে গবেষণা করা হবে, সেইসব বিষয়ে পরামর্শের জন্যে। কীসের ভিত্তিতে যোজনা কমিশন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে চান, অর্থনীতিবিদেরা তা জানতে চান। যে-মডেল নিয়ে যোজনা কমিশন কথা বলছেন, সে মডেল বোঝার লোক দেশে এখন যথেষ্ট। ডঃ রাজকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের পীড়াপীড়িতে যোজনামন্ত্রী শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর মে মাসে অর্থনীতিবিদদের দ্বিতীয় বৈঠক ডেকে সব কাগজপত্র দেখতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে বৈঠক আজও ডাকা হয়নি, অথচ পঞ্চম যোজনা তৈরি সম্পূর্ণ হতে চলেছে। যোজনা কমিশনের সদস্যেরা যেখানে অর্থনীতিবিদদের এড়াতে চান এবং এড়িয়েও রেহাই পান, সে-দেশে অর্থ নৈতিক সঙ্কট দূর হবে কী ভাবে?

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৩]

চিঠি

মহলানবিশ মডেল

"আমাদের আর্থিক দুর্গতি ঘোচায় কার সাধ্য?" প্রবন্ধে (১৪-১৫ নভেম্বর) শ্রীনিরঞ্জন হালদার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক বিতর্কমূলক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তবে তিনি জাতীয়করণের পর শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী নীতির সমালোচনা করলেও, জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি।

শ্রীহালদার মহলানবিশ মডেলের সঙ্গে রুশ অর্থনীতিবিদ ফেলডমানের মডেলের সামঞ্জস্য দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি মহলানবিশ মডেলকে রুশ মডেলের অনুকরণ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ডোমার নিজেই বলেছেন যে, ফেল'ডমান মডেল মহলানবিশের জানাই ছিল না, মহলানবিশের কৃতিত্ব ছোট করে দেখানোর প্রচেষ্টা খুবই নিন্দনীয়।—**শ্রীকল্যাণ দত্ত**, কলকাতা।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, নভেম্বর ২৯, ১৯৭৩]।

॥ ২ ॥

শ্রীকল্যাণ দত্ত তাঁর চিঠিতে (২৯-৩০ নভেম্বর) অভিযোগ করেছেন যে, "আমাদের দুর্গতি ঘোচায় কার সাধ্য?" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৪-১৫ নভেম্বর) আমি নাকি "মহলানবিশ মডেলকে রুশ মডেলের অনুকরণ" বলেছি। আমি লিখেছিলাম, মহলানবিশ মডেল রুশ-অর্থনীতিবিদ ফেলডমানের গ্রোথ মডেলের রকমফের"। "রকমফের" আর "অনুকরণে"র অর্থ এক নয়। কিন্তু ডোমারের মন্তব্য সত্ত্বেও অনুকরণ লিখলেও কোন অন্যায় হত না। "এসেজ ইন দি থিয়োরি অব ইকনমিক গ্রোথ" বইটির একটি পাদটীকায় ডোমার লিখেছেন: "A similar model was constructed by Mahalanobis was evidently not aware of Fel'dman's works. (P. 203).

দুটি লাইনে দুটি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এক, ডঃ মহলানবিশ ফেল'ডমানের মতো একই ধরণের মডেলের রচয়িতা। দুই, ডঃ মহলানবিশ ফেল'ডমানের কাজের কথা জানতেন না। প্রথমটি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। দ্বিতীয়টি ডোমারের নিজস্ব মতামত। ডোমারই ফেল'ডমানের প্রবন্ধ

ইংরেজিতে অনুবাদ করান বলে ডোমারের মনে হয়েছিল, তাঁর আগে ইংরেজি জানা কোনও ব্যক্তি ওই মডেলের কথা জানতেন না। একাধিক কারণে ডোমারের এ-ধারণা ঠিক নয়। এক, ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রচনার ব্যাপারে ডঃ মহলানবিশকে সাহায্য করার জন্য র‍্যাগনার ফ্রিশ, টিনবারজেন, গ্যালব্রেথ, সমর রায় ও আরও অনেকের সঙ্গে পোলিশ অর্থনীতিবিদ লাঙ্গে, কালেসকি এবং কয়েকজন সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। লাঙ্গে, কালেসকি ও সোভিয়েত অর্থনীতিবিদেরা ফেল'ডমান মডেলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দুই, এক ভাষার বিজ্ঞানী এক ধরনের অ্যাবস্ট্রাকটের মাধ্যমে অন্য ভাষার বিজ্ঞানীদের কাজ জানতে পারেন। বিজ্ঞানী হিসাবে এই ধরণের অ্যাবস্ট্রাকটের সঙ্গে ডঃ মহলানবিশের পরিচয় থাকার কথা, অর্থনীতিবিদদের তা জানার কথা নয়। তিন, কম্যুনিস্ট প্রচারে যতটা অনগ্রসর বলা হয়, রাশিয়া ১৯১৩ সালে ততটা অনগ্রসর ছিল না। ১৯৬১ সালে ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৮ কোটি টন, ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় ওই পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়, যদিও ওই বছরে রাশিয়ার জনসংখ্যা ছিল ১৯৬১ সালে ভারতের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। ১৯৫১ সালে ভারতে যে-পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন হয়, রাশিয়া ১৯১৩ সালে তার তিন গুণেরও বেশী ইস্পাত তৈরি করত। ১৯১০ সাল পর্যন্ত ভারত জারের রাশিয়ার কেরোসিনের বাজার ছিল (ভারত রুশ-কেরোসিনের নতুন রপ্তানি-বাজার নয়)। তাছাড়া, রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনও মিল নেই। কাজেই ফেল'ডমানের মডেলের সঙ্গে পরিচিত না থাকলে মহলানবিশ মডেল অন্য রকম হত। যেমন, এশিয়ায় চীন (১৯৫৭ সালের পর), ফরমোজা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য ভিন্ন ধরনের কর্মসূচী নিয়েছে।

কৃষি ও কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পের উপর অগ্রাধিকার না দিয়ে (চীন যা ১৯৫৮ সাল থেকে দিয়েছে), মহলানবিশ মডেল ভারতের বর্তমান দারিদ্র্যের জন্য কিছুটা দায়ী, সে-কথা বলা দরকার।

॥ ৩ ॥

যোজনা-দপ্তরের বক্তব্য

শ্রীনিরঞ্জন হালদারের "আমাদের দুর্গতি ঘোচায় কার সাধ্য" প্রবন্ধ (১৪-১৫ নভেম্বর) সম্পর্কে এই চিঠি।

ওই প্রবন্ধে লেখক অভিযোগ করেছেন যে, যোজনা-মন্ত্রী শ্রীডি-পি-ধর প্যানেল অব ইকনমিস্টদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পঞ্চম যোজনা রচনার ব্যাপারে যে-সব তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছিল, সে-সব প্যানেলের দ্বিতীয় বৈঠকে দেখানো হবে ; সেই সভা তখনও পর্যন্ত হয়নি (১৪ নভেম্বর, ১৯৭৩)।

আমাকে এ কথা জানানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, লেখকের ওই বক্তব্য ভিত্তিহীন এবং ভুল। ১৯৭৩ সালের ৬ মার্চ অর্থনীতিবিদদের বৈঠকে কয়েকজন প্রস্তাব করেছিলেন যে, যে-সব তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পঞ্চম যোজনা রচিত হচ্ছে, সেগুলি তাঁদের দিলে, তাঁরা তাঁদের সুস্পষ্ট মতামত জানাতে পারবেন। বৈঠকের সভাপতি শ্রীডি-পি-ধর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়ার এবং ১৯৭৩ সালের মে মাসে অর্থনীতিবিদদের আর একটি বৈঠক ডাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যথানিয়মে, ১৯৭৩ সালের ৫ই মে যোজনা-ভবনে দ্বিতীয় বৈঠক হয় এবং যোজনা কমিশন-প্রদত্ত কাগজপত্রের ভিত্তিতে পুরো আলোচনা হয়।—**কে-বি শর্মা**, তথ্য আধিকারিক (যোজনা), প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো, ভারত সরকার।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ ডিসেম্বর ১৯৭৩]

॥ ৪ ॥

যোজনা ও অর্থনীতিবিদ

"আমাদের দুর্গতি ঘোচায় কার সাধ্য ?" প্রবন্ধে (১৪-১৫ নভেম্বর) আমি অভিযোগ করেছিলাম যে, পঞ্চম যোজনার কর্মসূচী রচনার ব্যাপারে যোজনা কমিশন বেসরকারী অর্থনীতিবিদদের এড়িয়ে চলতে চান। উদাহরণ হিসাবে আমি (১) মার্চ মাসে ইকনমিস্টদের প্যানেলের সভায় কয়েকজন অর্থনীতিবিদ কর্তৃক পঞ্চম যোজনা রচনার কাগজপত্র দেখতে চাওয়া ও (২) প্রতিশ্রুতি মতো মে মাসে দ্বিতীয় সভা না ডাকার কথা উল্লেখ

করেছিলাম। যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে শ্রীকে-বি শর্মা "যোজনা দপ্তরের বক্তব্য" শীর্ষক চিঠিতে (২১-২২ ডিসেম্বর) আমার বক্তব্য ভিত্তিহীন ও ভুল বলে অভিহিত করলেও প্রথম অভিযোগ স্বীকার করেছেন। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, অর্থনীতিবিদদের বৈঠকে কয়েকজন প্রস্তাব করেছিলেন যে, "যে-সব তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পঞ্চম যোজনা রচিত হচ্ছে, সেগুলি তাদের দিলে তাঁরা তাঁদের সুস্পষ্ট মতামত জানাতে পারবেন।" অর্থাৎ পঞ্চম যোজনার ব্যাপারে অর্থনীতিবিদদের বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে লোকের ধারণা হলেও কয়েকজন অর্থনীতিবিদের প্রস্তাব শুনে প্রতীয়মান হয় যে, যোজনা কমিশন বৈঠক ডেকেছিলেন ভিন্ন উদ্দেশ্যে।

মে মাসের দ্বিতীয় বৈঠকের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়ার জন্যই আমার ওই ভুল হয়েছিল। কিন্তু যোজনা কমিশন যে-সমস্ত কাগজপত্র দেননি, শ্রীশর্মার চিঠিতে তার স্বীকৃতি আছে। "যোজনা কমিশন-প্রদত্ত কাগজপত্রের ভিত্তিতে" পুরো আলোচনার অর্থ সব কাগজপত্র দেওয়া নয়। মার্চ মাসের সভায় কয়েকজন অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির ও অর্থের বরাদ্দই যোজনা নয়। শ্রম শক্তির ব্যবহার এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা, প্রকল্প রচনা ও কার্যকর করার পদ্ধতির উন্নয়ন কর্মসূচী ছাড়া বিশেষ বিশেষ খাতে টাকার ব্যবস্থা করায় দেশে অপচয় বাড়ছে, বেকারী ও আঞ্চলিক অনগ্রসরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যোজনা কমিশন প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করলে তাঁরা বেসরকারী উদ্যোগে যোজনার ভিন্ন মডেল বা আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচী রচনা করতে আগ্রহী ছিলেন। শ্রী শর্মার চিঠিটি প্রকাশের পর আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, মে মাসে অর্থনীতিবিদদের বৈঠকে পঞ্চম যোজনার মডেল ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কাগজপত্র দেওয়া হয়েছিল, তার বেশী নয়।

পঞ্চম যোজনার খসড়া সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে ডঃ মিনহাস যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যানকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠির বিষয়ও যোজনা কমিশনের অন্য সদস্যদের জানতে দেওয়া হয়নি। দেশের উন্নতির জন্য যেখানে দেশবাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন, সেখানে এই জাতীয় গোপনীয়তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।—নিরঞ্জন হালদার, কলকাতা।

[আনন্দবাজার পত্রিকা। জানুয়ারি ২, ১৯৭৩]

উন্নয়নের পথ ঃ কলকাতা বনাম কৃষি ?

৪

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে গত কয়েক বছর যাবৎ একটা নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। কেবল কলকাতার উন্নয়নের জন্য টাকা খরচ করলে সমস্যার সমাধান হবে না, কৃষিতেই রাজ্যের বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। তিন ধরনের লোক এই জাতীয় কথা বলছেন। এক, যাঁরা বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ; দুই, যাঁরা বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু শহর এলাকায় কর্মসংস্থান-কর্মসূচী রচনা করতে পারেন নি। তিন, যাঁরা গ্রামাঞ্চলের অবহেলিত সমস্যা নিয়ে খুব বেশী চিন্তিত কিন্তু গ্রাম্য সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা নেই। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ এক নয়। তাই রাজ্যের অন্য এলাকা অবহেলিত রেখে কেবল কলকাতার উন্নয়নের জন্য টাকা খরচ করলে রাজ্যের অন্য এলাকার সমস্যা আরও জটিল হবে, শিক্ষিত বেকার ও গ্রামের গরিবেরা এই মহানগরীতে এসে আরও ভিড় করবে। সি-এম-ডি-এর মাধ্যমে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তাই কলকাতায় বহিরাগতের ভিড় বেড়েছে এবং এই ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকবে। যেহেতু বস্তি, ফুটপাথ ও রেল লাইনের পাশে ঘর করে বসবাসকারীরা গ্রাম থেকে আসে, সেহেতু অনেকের ধারণা কৃষির উন্নয়নের জন্য আরও টাকা খরচ করলে উন্নত কৃষি গ্রামাঞ্চলেই ওইসব লোকের কাজের ব্যবস্থা করবে এবং তখন ওরা আর এই শহরে এসে ভিড় করবে না। আগে এ-রাজ্যের কৃষির উপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, নতুন শিল্পও গড়ে উঠছে না। ফলে গ্রামে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৬১ সালে মোট চাষী পরিবারের শতকরা ২৮·৪ ভাগ ছিল ক্ষেত-মজুর পরিবার, ১৯৭১ সালে ক্ষেত-মজুর পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৪৫·৩ ভাগ। চাষবাসের ব্যয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি, বন্যা ও খরা এবং কৃষক পাট প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের

উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় গত তিন বছরে এই ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রাণ কার্যের মাধ্যমে সরকার গ্রামাঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু ঠেকাতে চেয়েছেন। এ-জন্ত ব্যয়ও কম হচ্ছে না। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই খাতে ব্যয় হয়েছে ১২.৬৮ কোটি টাকা, ১৯৬৯-৭০ সালে ৮.৪৭ কোটি টাকা, ১৯৭০-৭১ সালে ১১.২৯ কোটি টাকা, ১৯৭১-৭২ সালে ১৭.৩৯ কোটি টাকা, ১৯৭২-৭৩ সালে ১৬.৮৪ কোটি টাকা ১৯৭৩-৭৪ সালে ৯.১৫ কোটি টাকা এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের প্রথম ৮ মাসে ১৭ কোটি টাকা। এত টাকা খরচ করেও কিন্তু তাদের অবস্থার কোনও উন্নতি করা যায়নি। তাই নিম্নবঙ্গের গ্রামের গরিব মানুষেরা ভিড় করেছে কলকাতা, হলদিয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি এলাকায়। তাছাড়া, জাতীয় সড়কের উপর যেখানেই সুবিধাজনক মনে হয়েছে সেখানেই তারা ঘর বা চালা তুলেছে। উত্তরবঙ্গের দুর্দশাগ্রস্ত ও বন্যাতাড়িত মানুষ অন্য কোনও দ্বিতীয় শহর পায়নি, সবাই ভিড় করেছে শিলিগুড়িতে। কলকাতায় এই বহিরাগতদের জন্য মহানগরী পরিচ্ছন্ন রাখার কর্মসূচী অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সি-এম-ডি-এ নতুন জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য টাকা খরচ করেছে অথচ পুরোনো ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালা এই বহিরাগতদের জন্য বুঁজে যাচ্ছে। বাইরে থেকে এই জনস্রোত আসা বন্ধ না করলে মহানগরীতে উন্নয়ন বাবদ টাকা খরচ শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়বে।

আবার কৃষি-উন্নয়ন সম্পর্কে অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে। তাদের ধারণা জমিতে সেচের ব্যবস্থা, সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি-ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করলেই কৃষির উন্নতি হবে। কারণ তখন এক ফসলের জমিতে দুই, আড়াই বা তিনটি ফসল উঠবে, চাষীদের হাতে বেশী পয়সা আসবে এবং ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরেরা সারা বছর ধরে কাজ করার সুযোগ পাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব কর্মসূচী ছাড়া ২০টি এলাকার সি-এ-ডি-পি কর্মসূচী কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সি-এ-ডি-পি কর্তৃপক্ষ ওইসব এলাকায় কৃষি-উন্নতির বিভিন্ন কর্মসূচী কার্যকর করে এক ফসলের জমিকে তিন ফসলের জমিতে পরিবর্তন করবেন এবং সেই সঙ্গে পশুপালন, পোলট্রি, ডেয়ারির মাধ্যমে স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াতে সচেষ্ট হবেন। ধরে নেওয়া গেল, ওই এলাকাগুলিতে সি-এ-ডি-পি কর্মসূচী সফল হল, কিন্তু তাতে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সমস্যার কতটা হের-ফের হবে? আস্তে আস্তে সি-এ-ডি-পির এলাকা বাড়বে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সমস্যা কি ততদিনে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে? গ্রামাঞ্চলের

গরিব মানুষেরা কি রোজগারের সন্ধানে ও বাঁচার আশায় বড় শহর ও শিল্প নগরীতে এসে ভিড় করবে না? কলকাতা শহরে ভিখিরি, সমাজ-বিরোধী ও গণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি কি সমাজকে আরও কলুষিত করবে না? সরকার গোটা রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচী রচনার জন্ত ১৯৭২ সালে রাজ্য যোজনা পর্ষদ গঠন করেছিলেন। কিন্তু পর্ষদের সদস্যেরা সেই দায়িত্ব পালন না করে তাঁদের কেউ কেউ অনুপযুক্ত হলেও সি-এ-ডি-পি প্রকল্পে চাকরি বাগাতে উদ্যোগী হলেন। সি-এ-ডি-পি কর্মসূচীর ত্রুটিও কিন্তু অবহেলা করার মতো নয়। এই কর্মসূচী সফল হলে ক্ষেত-মজুরদের বছরে ২৪০ দিনের মতো কাজ দেওয়া যাবে। আট মাস কাজ করে সারা বছরের সংসার চালাতে পারবে, এমন ব্যবস্থা এদেশে চালু করা অসম্ভব। ফলে তারা বর্তমানের মতোই বড় শহরে এসে ভিড় করবে। মুরগী পালন ও গো-পালনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে মুরগী ও গরুর খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়নি। ভিন্ন রাজ্যে উৎপাদিত পশু খাদ্যের উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক আয় বাড়ানোর চিন্তা বাতুলতা মাত্র। এই কর্মসূচীতে গ্রামাঞ্চলের কর্মক্ষমদের একটা অংশকে কৃষির বাইরে অন্য কাজে লাগানোর ব্যবস্থা নেই। একই পরিবারের অপর কাউকে অন্যত্র অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে না পারলে সেই পরিবারের অবস্থার উন্নতির আশা কম। আসলে গ্রামের উন্নতির কথা ভেবে এই কর্মসূচী রচিত, গ্রাম্য-সমাজের পুনর্গঠনের সমস্যা এখানে অবহেলিত।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষির উন্নতি ও বড় শহরে জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্ত এই রাজ্যে শহর উন্নয়নের কর্মসূচী নেওয়া দরকার। এই শহর উন্নয়ন বলতে বর্তমান শহরগুলিতে কেবল পানীয় জল সরবরাহ, জলনিকাশী ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাট তৈরি বোঝায় না। জেলা, মহকুমা ও বাজার-শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী নিতে হবে। শহরের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগের জন্য আরও বেশী পাকা রাস্তা তৈরি করতে হবে। শহর ও বাজারের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা হলে কৃষক অতি সহজেই তার প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীট-নাশক কিনতে পারবে, আর উৎপাদিত ফসলও অতি সহজে বিক্রি করতে সমর্থ হবে। আগে কৃষিতে মূলধনের বিনিয়োগ কম ছিল, সামান্য উদ্বৃত্তের জন্য চাষ-বাস হত। তাই মাথায় করে গ্রামের হাটে ফসল বিক্রি করা সম্ভব হত, রাস্তা না থাকলেও ক্ষতির পরিমাণ তত বেশী ছিল না। কিন্তু এখন উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করেই ঋণের

টাকা পরিশোধ করতে হয়। কাছাকাছি ভাল বাজার বা দূরের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগের ভাল ব্যবস্থা না থাকলে উদ্বৃত্ত ফসল উপযুক্ত দাম না পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির সব সুযোগ থাকলেও তা কোনও কাজে আসবে না। জাপান, তাইওয়ান বা পাঞ্জাব সর্বত্রই মোটামুটি একই ধারা দেখা যাবে—গ্রামগুলি বাজার ও জাতীয় সড়কব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এইসব বাজারে ও শহরে কৃষক তার কৃষি-উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জিনিসই কেবল কিনবে না, ফসল বিক্রি করবে এবং ফসল বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকার একটা অংশ ভোগ্যপণ্যে ব্যয় করবে।

এ-রাজ্যে অ্যাগরো-সারভিস সেনটারের কথা ভাবা হচ্ছে, কিন্তু কৃষকের ভোগ্যপণ্যের ব্যয়ের কথা ভেবে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। শহর ও বাজারের সঙ্গে গ্রামগুলির উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা চালু হলে গ্রামের উৎপন্ন আনাজ, দুধ, ডিম প্রভৃতি স্বাভাবিক বাজার পাবে এবং গ্রামে থেকেই অনেকে কৃষির বাইরে পরিবহণ ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। পাঞ্জাবে সবুজ-বিপ্লব এলাকার কর্মক্ষমদের শতকরা ১৫ জন গ্রামে থেকে অন্য কাজ করে।) তখন গরিব কৃষি-পরিবারের দ্বিতীয় কর্মক্ষম ব্যক্তি অন্যভাবে পরিবারের আয় বাড়াতে পারবে। এজন্যই কৃষি উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে শহর উন্নয়নের কর্মসূচী নেওয়া দরকার। ভালো রাস্তাঘাট, বাজার এবং বাজারে পাকা বাড়ির অভাবে বিহারে ২০০টি ব্লকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি শাখাই খুলতে পারছে না। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে বিহারে গফুর-মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী দ্বারিকা প্রসাদ রাই বিহারের প্রতিটি ব্লকে ব্যাংকের শাখা খুলবার জন্য বিহারে অবস্থিত প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রতিনিধি নিয়ে আলোচনা সভা ডাকলে এই তথ্য জানা যায়।

ওই সব জায়গায় ব্যাংকের ঋণ মিললেও উদ্বৃত্ত ফসল ন্যায্য দামে বিক্রি করার সুযোগ না থাকায় উৎপাদন বাড়লেও কৃষকেরা ঋণ শোধ করতে পারবে না। কেবল গ্রামাঞ্চলের বাজার নয়, মহকুমা ও জেলা শহরগুলিতেও অঞ্চলের কৃষি উন্নতির চাহিদা মেটানো এবং কৃষকদের আয় ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্যভাবে ব্যয়ের ব্যাপারে উন্নয়ন কর্মসূচী নিতে হবে। চারিপাশের এলাকার সঙ্গে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি ও নতুন নতুন বাজার গড়ে উঠলে ওই সব শহরে অনেক কর্মক্ষম লোকের কাজের ব্যবস্থা হবে, বাজারের সুবিধার কথা ভেবে গ্রামাঞ্চলের কৃষিজমিতে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যাবে। ফলে ওই সব শহরে ও বাজারেই জেলা বা নিকটবর্তী লোকেরা যাবে কাজের সন্ধানে এবং একমাত্র

তখনই কলকাতার মত মহানগরীতে গ্রামের গরিব মানুষদের ভিড় কমানো যাবে। তাই কলকাতার উন্নয়নের বিকল্প কেবল কৃষির উন্নয়ন নয়। কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে কৃষির উন্নয়ন ও শহর এলাকায় কর্মসংস্থানের কথা ভেবে জেলা, মহকুমা শহর ও বাজারের উন্নয়ন এবং শহর ও বাজারের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী রচনা করা দরকার। দুঃখের বিষয়, গ্রামাঞ্চলকে রাজ্যের সড়কব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ১৯৭৭-৭৫ সালের রাজ্য সরকারের বাজেটে যে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, রাজ্য সরকার ওই খাতে টাকাটা আদৌ খরচ করেননি। সামগ্রিকভাবে রাজ্যের কৃষির উন্নয়নের কথা ভেবে শহর উন্নয়নকর্মসূচী রচনার কথা আপাতত এ-রাজ্যে কেউ ভাবছেনও না।

কৃষি-শ্রমিকদের সমস্যা

ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনায় কৃষি-শ্রমিকেরা আদৌ অবহেলিত নয়। কৃষি-শ্রমিকদের অর্থ নৈতিক অবস্থা কী করে ভাল করা যায়, যোজনা কমিশন রচিত বিভিন্ন পরিকল্পনায় সে-সব বিষয়ে বিশদ কর্মসূচী দেখতে পাওয়া যাবে। কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা বদলে দেবার নাম করে নকশালবাড়ি, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, শ্রীকাকুলাম ও বিহারের কয়েকটি এলাকায় নকশাল-পন্থীদের নেতৃত্বে মুক্ত-এলাকা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জমি দখল ও ধান কাটার অভিযান সি-পি-এম, সি-পি-আই, আর-এস-পি, এস-ইউ-সি প্রভৃতির নেতৃত্বে চালানো হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কৃষি-শ্রমিকদের অর্থ নৈতিক অবস্থার খুব বেশী ইতর বিশেষ হয়নি, রাজ্যের রাজনীতিতে তারা এখনও পর্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি।

কৃষি শ্রমিকেরাই দেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম শ্রেণী। যে-সব আদিবাসী সম্প্রদায় এক সময়ে বনের সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত, সরকার বনের মালিক হওয়ায় তারাও কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় যে সাঁওতাল, মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিবাসী কৃষি-শ্রমিকদের দেখা যায়, তারা বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম এবং বিহারের সাঁওতাল পরগণা, দুমকা ও অন্যান্য এলাকা থেকে এসেছে। কৃষি শ্রমিকদের পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা খুবই কম, নিরক্ষরের সংখ্যা এই সব পরিবারেই সবচেয়ে বেশী। গরিব বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বেঁচে থাকার পথও বন্ধ। কৃষি শ্রমিকদের একটি অংশ আবার সমাজে 'অস্পৃশ্য'। এদের কেউ শিক্ষিত হলেও সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান পরিবারে মানুষ হিসাবে মর্যাদা পায় না।

পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কৃষি শ্রমিকদের সারা বছরের কাজ থাকে না। মরশুমের সময় কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা কম থাকায় বা নিজেদের সংঘশক্তির

জোরে কোথাও কোথাও দিন-মজুরি বাড়ানো সম্ভব হলেও বছরের অবশিষ্ট সময় তাদের সপরিবারে কোন রকমে বেঁচে থাকতে হয়। কেবল কৃষি শ্রমিক নয়, অল্প-জমির মালিক এমন লোকদের অবস্থাও বর্তমানে খুব সঙ্গীন। কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা ভাল করার জন্ত প্রতিটি পরিকল্পনার কর্মসূচীতে তাদের বসত বাড়ির জন্ত জমি, সীলিংএর বাইরে উদ্বৃত্ত জমি সমবায়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিলি করা এবং শূকর মুরগী পালন প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবারের আয় বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এই সব কর্মসূচী কার্যকর করার ভার যাদের উপর, সেই সরকারী কর্মচারীরা যুক্তফ্রন্ট আমলে ও তার আগে বামপন্থী আন্দোলনে সামিল হলেও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর জন্য রচিত কর্মসূচী কার্যকর করার চেষ্টা করেন নি।

গ্রামে কৃষি-বিপ্লবের মাধ্যমে গরিব কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রীকাকুলাম, নকশালবাড়ি, ডেবরা বা গোপীবল্লভপুরে যারা লড়াইয়ের পথে যোগ দিল, দেখা গেল দরিদ্র কৃষক বা কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা ভাল করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। রাস্তাঘাট বা ট্রেনের যোগাযোগের অভাবে প্রথম প্রথম ওই সব এলাকায় মুক্তাঞ্চল গঠিত হলেও, পুলিসী ব্যবস্থা ও জনগণের প্রতিরোধের সামনে মুক্তাঞ্চল থেকে সব বিপ্লবীই পালিয়ে গেলেন। কৃষি-শ্রমিকদের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা ওই বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল না, গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ১৯৬৯ সনে জোরকরে জমি দখল ও ধান কাটার যে আন্দোলন হয়েছিল তাতেও কৃষি-শ্রমিকদের মনে হয়েছিল যে, জমির মালিকানা পেলেই তাদের অবস্থা ফিরবে। জমির মালিক হলেই যদি আর্থিক দুর্দশা ঘুচত, তা হলে গ্রামে গ্রামে কম-জমির মালিকদের মহাজন ও অবস্থাপন্ন চাষীদের নিকট প্রতি বছর জমি বন্ধক রাখতে হত না। কারণ জমি পেলেই চাষ হয় না। জমিতে ফসল ফলাতে গেলে লাঙ্গল ও বলদের সঙ্গে বীজ, সার, সেচের ব্যবস্থার জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়। অনাবৃষ্টি ও বন্যার হাত থেকেও ফসল রক্ষা করতে হয়। নতুন জাতের বীজ ব্যবহার করায় আজকাল প্রায় প্রতিটি ফসলের জন্য কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। জমিতে একাধিক ফসলের জন্য মাটিতে দস্তা ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। মাটির গুণাগুন পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের সার অন্যান্য সারের সঙ্গে মেশানো দরকার। আবার পরের জমির বদলে নিজের জমিতে কাজ করার জন্য ভরণ-পোষণেরও

নতুন ব্যবস্থা করতে হয়। জমি-দখলের সঙ্গে সমবায়-সমিতি গড়ে তোলা, উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষককে শিক্ষিত করা, নিরক্ষরতা দূর করা এবং গ্রামাঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার দরকার ছিল।

কল-কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে কৃষি-শ্রমিকদের আন্দোলনের মিল খুবই সামান্য। কেবল দুর্গাপুরের শ্রমিকদের সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীতে সকলেই ইস্পাত কারখানার আয়ের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চালানো খুবই কঠিন। অন্যত্র একই পরিবারের কোন কোন লোক অন্যত্র কাজ করায় পরিবারের আয়ের পথ দুর্গাপুরের মতো একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় না। কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার প্রকৃতি দুর্গাপুরের শ্রমিকদের চেয়েও শোচনীয়। কারণ প্রতিবেশী অবস্থাপন্ন কৃষি পরিবারের সঙ্গে বিরোধ বজায় রেখে সে বেঁচে থাকতে পারে না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক—দুইদিক থেকেই কৃষি-শ্রমিকদের জন্য বর্তমান অনুসৃত নীতি বদলানো দরকার। বাড়তি জমি থাকলে তা অবশ্যই কৃষি-শ্রমিকদের দিতে হবে। তবে গ্রামে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেই তাদের আর্থিক অবস্থা ফেরানো সম্ভব। পাঞ্জাবে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, উদ্যোগী লোক, সরকারী সাহায্য প্রভৃতির জন্য গ্রামের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা ১৫ জন গ্রামে থেকেই শিল্পে কাজ করে। গ্রামে অন্য কাজের সুযোগ থাকায় কৃষি-শ্রমিকদের দিন মজুরি এদেশে পাঞ্জাবেই সবচেয়ে বেশী এবং রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের লোকেরাই পাঞ্জাবে গিয়ে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে। গুজরাটের কেরা, বরোদা, সুরত ও মেশানা জেলা এবং হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রামের গরিব পরিবার গরু-মোষ পুষে ডেয়ারিতে দুধ সরবরাহ করছে। কৃষি-শ্রমিক হিসাবে কাজ করা অপেক্ষা গো-মহিষ পালন করা সেখানে অনেক বেশী লাভজনক। এসব কার্যক্রম অনুসরণ করতে হলে গ্রামাঞ্চলে বাজার, হাট বা নতুন এলাকায় সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবসা-কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সেখানে ধানের কল, গুদাম-ঘর, হিমঘর, দুগ্ধ সংগ্রহকেন্দ্র বা ডেয়ারি স্থাপন ছাড়া ছোট-খাট শিল্পও গড়ে তোলা দরকার। অধিক ফলনশীল বীজের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহ বা জমির মাটি পরীক্ষার কেন্দ্র ওইসব স্থানেই হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক-হারে মুরগী, গরু-মহিষ ও শূকর পালনের জন্য প্রয়োজনীয় পশুখাদ্যও ওইসব কেন্দ্র থেকে

সরবরাহ করতে হবে। দেশে ও বিদেশে মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য গ্রামাঞ্চলেই মাংস সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু করে, ওই মাংস বড় শহরে পাঠানো যেতে পারে। এই ধরণের কর্মসূচী কার্যকর হলে গ্রামের শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন পরিবারের লোকেরাও বাড়িতে থেকে কাজ করতে পারবে। গ্রাম্য অর্থনীতির উন্নয়নে সেটাই কাম্য হওয়া উচিত।

কৃষি-শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা সমাজের নেতৃত্ব নিতে পারে, এমন কোন কর্মসূচী আজও গ্রহণ করা হয়নি। সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ চালু হলেও সমাজে অনগ্রসর শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতায় পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মাঝে কৃষি-শ্রমিক পরিবারের যে পরিমাণ ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেত, পশ্চিমবঙ্গে আজকাল তাও যায় না। সাধারণ দৃষ্টিতে শিক্ষা তাদের কোন কাজে লাগে না। তাই তারাও পড়াশুনার কথা ভাবে না। শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর পরিবারের সত্যিকারের অসুবিধার দিকে সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলি এখনও দৃষ্টি দেয়নি। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে শৈশবে দুধ বা অন্য পুষ্টিকর খাদ্য জোটে না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীরের স্নায়ুব্যবস্থা ঠিক মতো কাজ করে না এবং সেজন্য তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা ও বুদ্ধি কমে যায়। মাতৃগর্ভে থাকার সময় এবং জন্মাবার পরে মায়ের খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপ্লেকসের ঘাটতি থাকায় ওইসব পরিবারের শিশুদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেনা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণের একটা সরকারী প্রকল্প আছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় বছর বয়স না হলে ভরতি হতে পারে না। তাই সাড়ে তিন বছর বয়স হওয়ার আগেই শিশুদের মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা তা পূরণ করতে অসমর্থ। আবার শৈশবে শিশুরা বাবা-মায়ের স্নেহ এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের চিন্তা করবার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। ভারতে একমাত্র ক্যাথলিক মিশনারিরাই সমাজের দরিদ্র এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অনগ্রসর শ্রেণীর কিশোরদের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দিকে কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাঁদের প্রচেষ্টা খুবই সামান্য। কৃষি-শ্রমিক পরিবারে শিক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়বে, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সেই সঙ্গে পরিবারের আর্থিক

ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী ও সমাজ সচেতন কৃষক আন্দোলনের অস্তিত্বের কথা বলা হলেও, এই রাজ্যে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও অবহেলিত পরিবার থেকে ডঃ আম্বেদকর, কামরাজ বা জগজীবন রামের মতো লোক সৃষ্টি হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

[পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্মারণিকা (সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলন), ১৯৭১]

কলকাতার সমস্যা ও তার সমাধান ৬

"While Maharastra and Gujarat can conceivably prosper without Bombay, Bengal will die when parted from Calcutta, as indeed will Calcutta separated from Bengal."—Sudhin Datta in "The World's Cities, Calcutta", Encounter, June, 1957.

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এক সর্বনাশা সঙ্কটের সম্মুখীন। আর এই সঙ্কটের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলকাতা। ভারতে অনেক রাজ্য আছে, যেসব রাজ্যে রাজধানী শহরের ঘটনা বা সঙ্কট গোটা রাজ্যে তেমন প্রভাব বিস্তার করে না। সাধারণ জীবনযাত্রা মোটামুটি নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। বোম্বাই শহরের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী পুনায় তেমন কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেনি। নাগপুর বিদর্ভের আন্দোলনও বোম্বাই বা পুনা শহরে কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। গুজরাতে আমেদাবাদ, সুরত, বরোদা ও রাজকোট শহর গোটা রাজ্যকে কখনও এক-শহর-কেন্দ্রিক হতে দেয়নি। উত্তর প্রদেশে রাজধানী শহর লক্ষ্মৌ বা অর্থনীতির দিক থেকে প্রধান কেন্দ্র কানপুরে যা ঘটেছে তার প্রতিফলন সব সময়ে বারাণসী বা এলাহাবাদে দেখা যাবে না। প্রতিবেশী বিহারে পাটনা অচল হলেও জামসেদপুর, ধানবাদ বা রাঁচীতে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকতে পারে। কারণ বিহারের তিনটি শিল্প-শহর আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে রাজধানী-শহরের উপর একেবারেই নির্ভরশীল নয়। এই অবস্থা বিহারে অন্য ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মত গোটা রাজ্যকে কলিকাতার উপর নির্ভরশীল হওয়ার সমস্যা থেকে সে-সমস্যা একেবারেই ভিন্ন। অবশ্য কলকাতার উপর কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও কমবেশী নির্ভরশীল। কয়েকটি পরিসংখ্যান মনে রাখলে সর্বভারতীয় ব্যাপারে কলকাতার

গুরুত্ব বোঝা যাবে। ১৯৬৪ সনে কলকাতা বন্দর দিয়েই ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ৪২ ভাগ বিদেশে গিয়েছিল এবং আমদানির শতকরা ২৫ ভাগ এদেশে এসেছিল। বৃহত্তর কলকাতার মত ভারতে আর কোথাও এত বেশী শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন হয় না। সারা ভারতের মোট শিল্পজাতদ্রব্যের শতকরা ১৫ ভাগ এখানেই উৎপাদিত হয়, ব্যাঙ্কিং লেনদেনের শতকরা ৩০ ভাগ এক কলকাতাতেই হয়ে থাকে। ভারতের উচ্চশিক্ষালাভেচ্ছু মোট ছাত্রদের শতকরা ১৩ ভাগ বৃহত্তর কলকাতাতেই পড়াশুনা করে।

পূর্বাঞ্চল ও কলকাতা

ভারতের পূর্বাঞ্চলে শহরে-বসবাসকারী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান মনে রাখলে কলকাতার আর একটি সমস্যা বুঝতে সাহায্য করবে।

চিত্র—১

রাজ্য	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	গ্রাম্য	শহুরে	শহুরে জনসংখ্যার হার
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪'৯	২৬'৪	৮'৫	২৪'৫%
বিহার	৪৬'৫	৪২.৬	৩'৯	৮'৪%
আসাম	১১'৯	১১'০	০'৯	৭'৪%
ওড়িশা	১৭'৬	১৬'৫	১'১	৬'৩%
সারাভারত	৪৩৯'২	৩৫৯'৮৭	৪'৪	১৮'০%
পূর্বাঞ্চল	১০৮'৯	৯৪'৫	১৪'৪	১৩'২%
কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গ	২৮'৪	২৫'৮	২.৬	৯'৩%

[সূত্র : ১৯৬১ সনের আদমসুমারির ভিত্তিতে সংকলিত] ২*

*১৯৭১ সনের আদমসুমারিতে শহুরে জনসংখ্যার হার ছিল : পশ্চিমবঙ্গে—২৪'৫৯%, বিহারে—১০'০৪%, আসামে—৮.৩৯%, উড়িশায়—৮.২৭%। সর্বভারতীয় গড়—১৯'৮৭%। (সেনসাস অব ইণ্ডিয়া ১৯৭১। সিরিজ ১। পৃঃ ৫)।

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সারা ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ শহরে বাস করলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঐ হার অনেক বেশী—শতকরা ২৪.৫ ভাগ। গোটা পূর্বাঞ্চলে শহরে জনসংখ্যার হার সর্বভারতীয় হার অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ শতকরা ১৩.২ ভাগ। এখানে মনে রাখা দরকার যে ১৯৬১ সনে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৮·৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৮৫ লক্ষ শহুরে লোকের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতাতেই বসবাস করত ৬·৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬৫ লক্ষ লোক। (বৃহত্তর কলকাতা বলতে কলকাতা পৌরসভা ছাড়া হুগলি নদীর দুই তীরে আরও ৩৪টি পৌর এলাকা বোঝায়। এই এলাকাকে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিষ্ট্রিক্ট বা সংক্ষেপে সি এম ডি বলা হয়।) বিহার, আসাম এবং উড়িশায় শহুরে জনসংখ্যার হার যথাক্রমে শতকরা ৮·৪ ভাগ, ৭·৭ ভাগ এবং ৬.৩ ভাগ। বৃহত্তর কলকাতা বাদে অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের শহুরে জনসংখ্যার হার প্রতিবেশী রাজ্যের হারেরই কাছাকাছি অর্থাৎ শতকরা ৯·৩ ভাগ। এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, বৃহত্তর কলকাতা ও আসানসোল-দুর্গাপুর এলাকায় এ রাজ্যের মফস্বলের লোকের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকেও অসংখ্য লোক ভিড় করে থাকে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে শহুরে লোক যখন গ্রামে পরিবারের লোকদের নামে টাকা পাঠায়, তখন সে-টাকা নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে খরচ হয়। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার অধিবাসীরা আত্মীয়দের নিকট টাকা পাঠালে সে-টাকা ভিন্ন রাজ্যে চলে যায়। কলকাতার সমৃদ্ধি ও সঙ্কট এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সনের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২১·৬ ভাগ, এই সময়ে শহুরে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৬·৫ ভাগ। এই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ছোট শহরগুলিতে তেমন ঘটেনি। এক লক্ষের বেশী লোকের বসবাসকারী শহরে জনসংখ্যা শতকরা ৪৮ ভাগ বেড়েছে, দশ-লক্ষের বেশী লোকের শহরে বেড়েছে শতকরা ৫১·১ ভাগ। উন্নতিশীল দেশগুলিতে শহুরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা কেবল কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ বা বাঙ্গালোরে দেখা যাবে না, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, জাকার্তা, ম্যানিলা, সিওল—সর্বত্রই দেখা যাবে। শহুরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সর্বত্র সমানভাবে ঘটছে না, বেশী বড় শহরেই অনেক বেশী লোক ভিড় করছে। পড়াশুনা ছাড়া অন্য কোন্ কোন্ কারণে লোকে বড় শহরে ভিড় করে, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

চিত্র—২

(শতকরা হার)	বড় শহরে	সব শহরাঞ্চলে
(১) চাকুরির জন্য		
পুরুষ	৪৭·৩	২৮·৮
মহিলা	৯·৬	১·৮
(২) ভাল চাকুরির জন্য		
পুরুষ	১০·১	১১·৩
মহিলা	০·৯	০·১
(৩) বিয়ের জন্য		
পুরুষ	০·১	০·০
মহিলা	২৭·৭	৪৬·২
(৪) চাকুরে আত্মীয়ের সঙ্গে থাকার জন্য		
পুরুষ	১১·১	১৬·৫
মহিলা	৩০·১	২৬·০

কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ

সব শহরাঞ্চলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির যে হার দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা কিন্তু সত্য নয়। কারণ ১৯৬১ সনের আদমসুমারির রিপোর্ট অনুসারে আগের দশকে এই রাজ্যের কোন কোন পৌরসভায় জনসংখ্যা তো বাড়েই নি, কোথাও আবার কমেও গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী রাজ্য থেকে বৃহত্তর কলকাতায় ভিড় করার ধারা ১৯৬৬ সনেও অব্যাহত ছিল। কারণ এই এলাকার জনসংখ্যা ১৯৬১ সালের ৬৫ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ঐ বছরে ৭৫ লক্ষ হয়েছিল। ৪।

বৃহত্তর কলকাতা ও বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর—আসানসোল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় শিল্প বলতে প্রধানত রাইস মিল। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় চা-বাগিচা এলাকাতেও নতুন কর্ম সংস্থানের কোন সুযোগ

নেই। কৃষির উন্নতি এপর্যন্ত বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেই সীমাবদ্ধ। ফলে কৃষিতেও বেশী লোককে ধরে রাখা অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল থেকে তাই কাজের সন্ধানে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও নিরক্ষর লোকেরা কলকাতায় এসে ভিড় করে। মফস্বল থেকে কলকাতায় এসে মেসে-হোস্টেলে বা আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে যারা পড়াশুনা করে, তাদের বেশীরভাগই আর গ্রামে ফিরে যায় না। কিন্তু কলকাতা এসে তারা কি চাকরি পায়? পায় না। কারণ ১৯৬১ সনের আদমসুমারি অনুসারে জুটমিলের শতকরা ৭৯ জন, কাপড়কলের শতকরা ৫৪ জন, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শতকরা ৪৯ জন, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের শতকরা ৫৪ জন, কাগজ-কলের শতকরা ৭৩ ভাগ শ্রমিক ভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে। শ্রমিকদের মোট মজুরির শতকরা ৬১ ভাগ বহিরাগত শ্রমিকদেরই পকেটে যায়। গত কয়েক বছরে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে এ-রাজ্যের শ্রমিকদের যে-বেতন বেড়েছে, সেই বর্ধিত বেতনের প্রায় পুরোটাই ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এখানেই তফাৎ। মহারাষ্ট্রে কলকারখানার মালিক গুজরাতী বা বিদেশী হলেও শ্রমিকশ্রেণীর বেশীরভাগ মহারাষ্ট্রের অধিবাসী এবং সেজন্য তাদের বেতনের প্রায় পুরোটাই রাজ্যের মধ্যে খরচ হয়। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের আয়ে এ রাজ্যের গ্রামের চাষীর উন্নতির কোন সুযোগ নেই। কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত অ-বাঙালীদের হাতে। অ-বাঙালী মিল মালিকদের কারখানার পাইকারি-বিক্রেতা বা কাঁচামাল সরবরাহকারীও এ-রাজ্যের লোক নয়। এ রাজ্যের জুটমিলগুলিতে ব্যবহৃত বেশীরভাগ পাটই পশ্চিমবঙ্গের চাষী উৎপাদন করে থাকে। চাষীকে পাটের জন্য কম দাম দিয়ে অবাঙালী পাটব্যবসায়ী, জুটমিলের মালিক ও পাট-রপ্তানীকারক এবং জুটমিলের শতকরা ৭৯ ভাগ অবাঙালী শ্রমিকের যে আয় বাড়ছে, তাতে এ-রাজ্যের কোন উপকার হচ্ছে না। পাটশিল্পের উন্নতির সঙ্গে পাট-চাষীদের সম্পর্কের কথা চিন্তা করা হয় না বলেই উন্নতজাতের গম, ধান, বা কার্পাসের সঙ্গে উন্নতজাতের পাট উৎপাদনের কোন ব্যাপক কর্মসূচী আজও নেওয়া হয়নি। গ্রামকে শোষণ করে শহরের সমৃদ্ধির যে ধারা গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন, সেই ধারা পশ্চিমবঙ্গের মতো আর কোথাও এত বাস্তব নয়। দেশ-বিভাগের পর মহানগরী ও বৃহত্তর কলকাতায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন না করলে বৃহত্তর কলকাতায় বাঙালীদের সংখ্যাধিক্য থাকত কিনা সন্দেহ। ১৯৬১ সনের

আদমশুমারি অনুসারে খাস কলকাতা পৌর এলাকাতেই জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ ১৩ জন অবাঙালী।

যে-বাঙালী পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল থেকে এই মহানগরীতে আসছে এখানে তার স্থান কোথায়? কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তার প্রবেশের সুযোগ খুবই সীমিত। গ্রামাঞ্চলে তাঁর যে উদ্যোগ-প্রবণতা কাজে লাগতে পারত, কলকাতায় তা কোন কাজেই আসছে না। এখানে সে কারখানায় কখনও অস্থায়ী-অদক্ষ শ্রমিক। কেউ বস্তিবাসী হয়ে হকার বা ঐ জাতীয় কোন কাজ করছে। পরিবারের প্রথম শিক্ষিত যুবক জানাশুনার অভাবে এখানে কাজ পাচ্ছে না। এরা মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে হতাশা ও উগ্র চিন্তাধারা বিস্তারে সাহায্য করছে মাত্র।

কলকাতা ও বাঙালী মানসিকতা

কলকাতা ভারতের মধ্যে বাংলা সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির বলতে গেলে একমাত্র কেন্দ্র। বিভিন্ন চিন্তাধারা কলকাতা থেকেই সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভাল ভাল ছাত্র পড়াশুনার জন্য কলকাতাতেই এসে থাকে। মেডিকেলে পড়াশুনার জন্য কলকাতা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াশুনার জন্য যাদবপুর ও শিবপুরেই বাঙালী ছাত্রের বেশী ভিড়, খড়্গপুরের আই-আই-টি এখনও পর্যন্ত বাঙালী মনোজগতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারেনি। বিশ্বভারতীর অস্তিত্ব সত্ত্বেও কলকাতাই রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। বাংলা সিনেমা ও নাটক বিভিন্ন সময়ে সারা ভারতে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। খুন-জখমের রাজত্বের মধ্যেও কলকাতায় শিল্প-মেলা হয়, মুসলমান ছেলে-মেয়েরা নিজেদের সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করতে উদ্যোগী হয়। কলকাতাই ভারতের একমাত্র রাজ্যের রাজধানী, যেখানে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকের প্রচার-সংখ্যা অন্যান্য দৈনিকের প্রচার-সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়। কলকাতা ছাড়া এপারের বাঙালীর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার আর কোন স্থান নেই। তাই কলকাতার অর্থনীতিতে বাঙালীর কোন স্থান না থাকলেও কলকাতা নিয়ে বাঙালীর গর্বের সীমা নেই এবং কলকাতার বাঙালীর কাছে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা সমার্থক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জাতীয় চিন্তার ফলে কলকাতা

ও অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ—উভয়েরই সমস্যা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য এই উভয় সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে হবে।

কলকাতা সম্পর্কে অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন কলকাতার সমস্যাগুলি এত ব্যাপক যে ওইসব সমস্যা সমাধানের নামে অর্থ ব্যয় করলেও কোন লাভ হবে না। অনেকে বলছেন, ঐ টাকা কলকাতায় না ঢেলে ওড়িশার ভুবনেশ্বর বা গুজরাতের গান্ধীনগরের মত পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজধানী শহর তৈরি করা যাক। কলকাতার উন্নয়নের জন্য যে টাকা লাগবে, তার চেয়ে অনেক কম টাকায় এ-রাজ্যে একটা নতুন ও সুন্দর শহর গড়ে তোলা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন রাজধানী শহর স্থাপিত হলেও কলকাতার সমস্যা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। কারণ কলকাতা এখনও ভারতের সবচেয়ে বড় শহর এবং অর্থনৈতিক কারণেই কলকাতায় অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ও সারা ভারতের লোক এসে ভিড় করবে। কলকাতার সমস্যা এড়াতে চাইলে সমস্যা-গুলি আরও জটিল আকার ধারণ করবে মাত্র।

কলকাতায় শহর স্থাপনের মূলে কোন পরিকল্পনা ছিল না। ১৬৮৬ সনে মোগল সৈন্যদের হাতে হুগলিতে ইংরেজ কুঠি লুণ্ঠিত হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক লোকজন নিয়ে সুতানটিতে চলে আসেন। সুতানটির দক্ষিণে গার্ডেনরীচে তখন পর্তুগীজ জাহাজ ভিড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। জব চার্নক দেখলেন নতুন জায়গাটা তিন দিক দিয়ে জলপথে সুরক্ষিত। পশ্চিমে হুগলি, দক্ষিণে আদি গঙ্গা, পূবে লবণ হ্রদ। প্রথম দিকে জাহাজের মাধ্যমে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে কলকাতার গুরুত্ব চিন্তা করা হয়েছিল। তারপর কলকাতা ভারতের রাজধানী হয়েছে, রেলপথে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, হুগলির দুই তীরে সারি সারি জুটমিল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা স্থাপিত হয়েছে, এইসব মিল, কারখানা ও কলকাতার সওদাগরি অফিসে কাজ করার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে লোক এসেছে। ইংরেজশাসক ও ব্যবসায়ীশ্রেণী, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী—সকলেই কলকাতাকে অর্থ উপার্জনের কেন্দ্র হিসাবে ভেবেছে, এই শহরের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেনি। বাঙ্গালী ধনীরা প্রথমদিকে বাবু কালচার এবং পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে ডুবে থেকেছেন, কলকাতার সমস্যা তাঁদের চিন্তার মধ্যে স্থান পায়নি।

কলকাতার উন্নতির কথা নিয়ে এই শহরের কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। ১৯১৯ সালে এক বিদেশী অধ্যাপক প্যাট্রিক গেদ্দেস এই শহরের উন্নয়ন সম্পর্কে পৌরসভার নিকট রিপোর্ট দিয়েছেন।৫ "বড়বাজার উন্নয়নের" জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, কলকাতা শহরে প্যারিসের অনুকরণে বাসগৃহের উন্নতি ও মেরামত ব্যবস্থা চালু করা, শহরের রাস্তাঘাটগুলি চওড়া করা, শ্রমিকশ্রেণীর বসবাসের জন্য নতুন নতুন বাড়ি তৈরি করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, রাস্তায় নতুন বৃক্ষরোপণ, নদীর তীরকে নাগরিকদের বেড়াবার জায়গায় পরিণত করা সম্পর্কেও তিনি কলকাতা পৌরসভার নিকট সুপারিশ করে ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক-সচেতন কলকাতার বাঙালীরা শহরের উন্নতির জন্য কিছুই করেননি। কলকাতায় সারা বছরব্যাপী কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে চিন্তিত হলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বৃহত্তর কলিকাতার ২৭০ বর্গমাইল এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ, জল নিকাশী ব্যবস্থা ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী স্থাপনের জন্য একটি মেট্রোপলিটন অথরিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। বর্তমানে বৃহত্তর কলকাতায় যে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তা ওই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাঙ্কের হফম্যান রিপোর্টের ফল। সর্বভারতীয় অর্থনীতিতে কলকাতার ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় কলকাতার উন্নয়নের প্রশ্ন অবহেলা করায় হফম্যান রিপোর্টে ভারত সরকারের সমালোচনা করা হয়। হফম্যান রিপোর্টের কপি পেয়েই ডঃ বিধানচন্দ্র রায় কলকাতার উন্নয়নের জন্য সি-এম-পি-ও গঠনে উদ্যোগী হন। কিন্তু হফম্যান-রিপোর্ট ও ডঃ রায়ের প্রচেষ্টাকে কলকাতার রাজনৈতিক দলগুলি ভাল চোখে দেখেনি, পৌরসভাগুলিও নিজেদের তথাকথিত অধিকার রক্ষার নামে উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়ে এসেছে।৬

কলকাতার সমস্যা

কলকাতার উন্নয়নের জন্য যে সব কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে সেগুলি পর্যালোচনার আগে কলকাতার সমস্যাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬১ সনে কলকাতা পৌরসভার ৩৬'৯২ বর্গমাইল এলাকায় মোট জনসংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ ৩৭ হাজার। বর্তমানে ঐ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ লক্ষ হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই সঙ্গে প্রতিদিন শহরতলি থেকে ১০ লক্ষ লোক কলকাতায়

কাজ, ব্যবসা ও পড়াশুনা উপলক্ষে যাতায়াত করে থাকে। ঘনবসতির দিক থেকে বিশ্বে কলকাতার স্থান টোকিওর পরেই। ১৯৬১ সনে কলকাতার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ছিল ৭৩,৬৪২ জন। অবশ্য বড়বাজারে এই সংখ্যা ১০২,০১০ জন। আমেদাবাদে এই সংখ্যা ৫৬,৬৪০, দিল্লিতে ৪১,২৮০ এবং নিউ ইয়র্কে ২৭,৯০০ জন। ১৯১৯ সালেই অধ্যাপক গেদ্দেস জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় নতুন বাড়ি তৈরি হতে দেখেননি। তারপরেও সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে। ফলে ১৯৬১ সনে মহানগরীর আট লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। উদ্বাস্তু কলোনি ও বস্তি-জাতীয় পুরানো বাড়ির সংখ্যা ধরলে বস্তি-বাসীর সংখ্যা ২০ লক্ষ লোক হওয়াও বিচিত্র নয়। মহানগরীর শতকরা ২৫টি বাড়ির কোন পাকা দেওয়াল নেই। প্রতি পরিবার কী পরিমাণ জায়গা দখল করে আছে, সে-তথ্য একেবারেই অর্থহীন। কারণ মহানগরীর শতকরা সাড়ে ৭টি পরিবারের পৃথক বাড়ি বা ফ্ল্যাট আছে। মহানগরীর জনসংখ্যার শতকরা ৭৪ জন আধা-পাকা বাড়িতে, শতকরা ২৮ জন কাঁচা বাড়িতে, এবং শতকরা ২০.৫ জন মেস, হোটেল বা দোকানে বাস করে। পরিবার হিসাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, মহানগরীর শতকরা ৫৭.৬টি পরিবার এক ঘরে বাস করে, শতকরা ২০·৬টি পরিবারের দু-খানা ঘর আছে। শতকরা ৪৯টি পরিবারের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, শতকরা ৫১টি পরিবারের নিজস্ব বাথরুম নেই। বস্তিতে বসবাসকারী ১৮৯,০০০ পরিবারের মধ্যে মাত্র শতকরা ২ জনের পৃথক পায়খানা ও বাথরুম আছে, প্রতি ৭টি পরিবারে ১টি পরিবারের জন্য কোন পায়খানার ব্যবস্থা নেই, শতকরা ৮২টি পরিবারকে অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে একই পায়খানায় যেতে হয়। বর্তমানে কলকাতার প্রায় সর্বত্রই রাস্তার ফুটপাথে বসবাসকারী পরিবার দেখা যাবে। এরা কোথায় স্নান করে, কোথায় মলমূত্র ত্যাগ করে—এসব প্রশ্নও কম জরুরী নয়।

জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা বাড়েনি, বরং কমে গিয়েছে। ফলে পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি বসতি-এলাকা ছাড়া সর্বত্রই রাস্তার উপর জঞ্জালের স্তূপ দেখা যাবে। তাই অনেকেই এই শহরকে 'জঞ্জালনগরী' আখ্যা দিয়েছেন। শহরের যত্রতত্র খাটালের অস্তিত্বও গোটা পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে। লোকে বাড়ির নোংরা পরিবেশ ছেড়ে খোলা জায়গায় গিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচবে, কলকাতায় এমন সুযোগ খুবই কম। মহানগরীর ১০০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২০টি

ওয়ার্ডে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা করার মত পার্ক বা খেলার মাঠ নেই। ১৩টি ওয়ার্ডে ১০ একরের কিছু বেশী ফাঁকা জায়গা আছে, মাত্র ৯টি ওয়ার্ডে ২৫ একরের বেশী খোলা জায়গা। বিশ্ব-মান অনুসারে শহরের প্রতি এক হাজার লোক পিছু ৪ একর ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার, কলকাতায় সেখানে আছে মাত্র আধ একর, শহরতলি পৌরসভায় আরও কম—এক একরের পাঁচ ভাগের দুই ভাগেরও কম। বৃহত্তর কলকাতার ৩৪টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ৯টিতে ১০ একরের বেশী পার্ক বা খেলাধূলার জায়গা আছে। হাওড়ার সি-আই-টি ছাড়া অন্য কোন পৌরসভায় পার্ক বা খেলার মাঠ তৈরির কোন পরিকল্পনাই নেই। বৃহত্তর কলকাতায় খেলাধূলার যে-টুকু ব্যবস্থা তা সবই পুরুষদের জন্য, সেখানে মেয়েদের কোন স্থান নেই। সি-এম-পি-ও রচিত অন্তর্বর্তীকালীন পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হওয়ায় বৃহত্তর কলকাতায় পানীয় জলের সরবরাহ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা ও হাওড়া শহরে হুগলি নদীর জলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য পানীয় জলের সরবরাহ বাড়ানো অসুবিধাজনক। ফরাক্কার ফীডার ক্যানেল দিয়ে গঙ্গার জল ভাগীরথীতে এলে এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে। পানীয় জলের অভাবে বহু এলাকার অধিবাসীরা ডোবা ও পচা পুকুরের জল ব্যবহার করে থাকে এবং সেজন্য কলেরা, বসন্ত, উদরাময় এই শহরে প্রতিবছরই ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। মহানগরীর শতকরা ৪৪ ভাগ এলাকায় জলনিকাশের কোন ব্যবস্থাই নেই। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই কলকাতা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে আছে কলকাতার পরিবহণ সমস্যা। মহানগরীর ৩৫ লক্ষ ও শহরতলির ১০ লক্ষ নরনারীর পরিবহণের ব্যবস্থা কেবল ট্রাম ও বাসে সম্ভব নয়। জনসংখ্যার তুলনায় স্বল্প সংখ্যক রাস্তা, রাস্তায় আবর্জনা জমে থাকা, ট্রাফিক-আইন না মেনে চলা, ফুটপাথ দিয়ে পদযাত্রীদের চলাফেরার অসুবিধার জন্য ট্রাফিক-জ্যাম লেগেই আছে। কোনো রাস্তা মেরামত আরম্ভ হলে কত বছর পরে যে কাজ শেষ হবে, কলকাতা শহরে তা কেউ বলতে পারেন না। শহরতলিতে বাড়ি করে অনেকে কলকাতার জনসংখ্যার চাপ কমাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গত এক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন অজুহাতে বা রেলের বৈদ্যুতিক তার কাটা যাওয়ায় সপ্তাহের মধ্যে অন্তত ৪ দিন শহরতলি রেলপথের কোন না কোন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকছে। এই অবস্থা আর কিছুদিন চলতে থাকলে দূরের শহরতলি ছেড়ে অনেকেই

আবার কলকাতার মধ্যে বসবাস করতে আগ্রহী হবেন।

পড়াশুনার জন্য বাইরে থেকে অনেকে শহরে আসে। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেও অনেকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। ১৯৬১ সনেই মহানগরীতে এক লক্ষ শিশু এবং শহরতলিতে ১ লক্ষ ৪২ হাজার শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি। মহানগরীতে ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে নি।[৭] ১৯৬১ সনে বৃহত্তর কলকাতার সব বয়সের মোট ২৩ লক্ষ বা শতকরা ৪৪ ভাগ অধিবাসী নিরক্ষর ছিল।[৮] যে-বিপুল সংখ্যক শিশু ও প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পরবর্তী জীবনে জীবিকার জন্য তারা কোন্ পথ বেছে নেয়, এ-কথা কারও মনে হয় কিনা সন্দেহ। পকেটমার, ছিনতাই, ওয়াগন থেকে মাল পাচার, চোলাই মদের ব্যবসা ও অন্যান্য সমাজ-বিরোধী কাজে এই শ্রেণীর নিরক্ষরেরা হয়তো সহজেই প্রলুব্ধ হয়। কলকাতা শহরে যারা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না, তাদের বেশীর ভাগ হিন্দী ও উর্দুভাষী এবং সুন্দরবন এলাকা থেকে আগত বাঙ্গালী। কলকাতার তথাকথিত অতি-সচেতন রাজনৈতিক পরিবেশে ওইসব অবহেলিত সমাজের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী না হয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনা-বেতনে পড়ানোর জন্য আন্দোলন করছেন তাঁরা গরিবের কী ধরনের বন্ধু, উপরের তথ্য থেকেই তা বোঝা যাবে।

উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা

কলকাতা পৌর-এলাকা বা বৃহত্তর কলকাতার ব্যাপক উন্নয়নের কর্মসূচী রচনা এবং তা কার্যকর করা পৌরসভাগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, কলকাতা ছাড়া অন্য পৌরসভাগুলির আয় খুবই সীমিত। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় বিভিন্ন পৌরসভা পৃথকভাবে পানীয় জল সরবরাহ, জলনিকাশী ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী প্রকল্প কার্যকর করলে খরচ অনেক বেশী পড়বে। তাছাড়া, প্রতিটি পৌরসভা ওই এলাকার নোংরা জল পৌর-এলাকার বাইরে ফেলেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, কিন্তু ওই কাজ পাশের পৌরসভার নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা, তা বিবেচনা কর হয় না। এজন্য বোম্বাই শহরতলির সব শহর-

এলাকাই পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংককেও চাও পাই নদীর দক্ষিণ-তীরে গোটা শহর এলাকা ব্যাংকক পৌরসভার অধীন। ম্যানিলায় অনেকগুলি পৌরসভার অস্তিত্বের জন্য বৃহত্তর ম্যানিলাকে নিয়ে একটা মেট্রো-পলিটান ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটি গঠিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটি গঠিত হয়েছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পৌরসভার প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে মেট্রোপলিটান ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটিতে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় অকেজো করে রেখেছেন। পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে নাগরিকদের উপর জলের জন্য কর বসাতে পৌর প্রতিনিধিরা আপত্তি করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি কর্মসূচী রূপায়ণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হওয়ায় এক কলকাতা-পৌর এলাকা ছাড়া আর কোথাও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, জলনিকাশী ও পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধির প্রকল্প বড় একটা কার্যকর হচ্ছে না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে উন্নয়ন-কর্মসূচী কার্যকর না করলে হাওড়া জেলার জুট মিল-ভিত্তিক শহর-এলাকাগুলি বিচ্ছিন্ন শহরে-পকেট হিসাবে বিরাজ করবে, গোটা এলাকা শহরে পরিণত হতে পারবে না। বরানগর থেকে বারাকপুর এলাকার পৌর-সভাগুলি সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য। এ রাজ্যের পৌরসভা-গুলির আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে সম্পত্তি-কর। কিন্তু সম্পত্তির মূল্যায়ন করার মত শিক্ষিত কর্মী এক কলকাতা পৌরসভা ছাড়া অন্য কোন পৌরসভায় নেই। আবার কলকাতা পৌরসভাতেই কাউন্সিলারদের মাধ্যমে করের হার হ্রাস করা যায়। কর-নির্ধারণের বিপক্ষে পৌর-আদালতে মামলা ঠুকে বছরের পর বছর কর বকেয়া রাখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে বড় শহর হিসাবে কলকাতার করের হার নিম্নতম এবং অকিঞ্চিৎকর। বোম্বাই-এর তুলনায় করের হার অর্ধেকেরও কম। ছোট পৌরসভাতে করের হার খুবই কম, কর-দাতাদের ভোটের কথা ভেবে তাও কমানো হয়। আয় কম বলে কলকাতা পৌরসভা শহর পরিচ্ছন্ন ও জন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যে সামান্য কর্মসূচী কার্যকর করে থাকেন, শহরতলির পৌর-সভাতে তাও দেখা যাবে না। তাই বৃহত্তর কলকাতায় বসন্ত দেখা দিলে বসন্তের টিকা দেওয়ার জন্য বর্তমানে সি-এম-পি-ও এবং রাজ্য সরকারের শরণ নিতে হয়। কোন রকম পৌর-সুযোগ-সুবিধা নেই বলে শহরতলির পৌর-সভাগুলিতে বড় বড় বাড়িও তৈরি হচ্ছে না, যা তৈরি হলে পৌরসভার আয়

বাড়তে পারে। পৌরসভার আয় বাড়াবার আর একটি পথ হল লাভজনক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। শহর-এলাকায় প্রচুর সংখ্যক বাজারের বাড়ি তৈরি করে বা বড় শহরে নিজস্ব কসাইখানা চালু রেখে পৌরসভা আয় বাড়াতে পারে। আর এ-সব ব্যাপারে জীবনবীমা সংস্থাও ঋণ দিয়ে থাকে। আমেদাবাদ পৌরসভা শহরে প্রয়োজনীয় দুধ সরবরাহ এবং দক্ষতার সঙ্গে বাস সার্ভিস চালিয়ে থাকেন। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে এই দুটি সংস্থা কলকাতা পৌর-সভার হাতে নেই, তাই করদাতারা ঐ দুটি সংস্থার লোকসান মেটানোর জন্য অতিরিক্ত কর দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। পাঞ্জাব-হরিয়ানা ও পশ্চিম ভারতে অকটোরয় ডিউটি আছে। বৃহত্তর কলকাতায় ১৯৭০ সালে ঐ কর চালু হয় এবং রাজ্য সরকার কর আদায় করে বিভিন্ন পৌরসভার মধ্যে এই টাকা ভাগ করে দেবেন। আমেদাবাদ ও বোম্বাই পৌরসভা গাড়ির উপর কর আদায় করে থাকেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় চার কোটি টাকা কর আদায় করে কলকাতা পৌরসভাকে মাত্র দশ লক্ষ টাকা দিয়ে থাকেন, অন্য পৌরসভাগুলি রাজ্য সরকারের নিকট থেকে বার্ষিক গ্রান্ট পায়, ঐ করের অংশ হিসাবে কিছু পায় না। পৌরসভাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির উপরেও কর বসাতে পারে না, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ঐ সম্পত্তির জন্য কিছু টাকা পেয়ে থাকে। পৌরসভাগুলির আয় বাড়ানোর জন্য এসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কিন্তু কেবল পৌরসভার টাকায় বা পৌরসভার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বৃহত্তর কলকাতার সমস্যাগুলির সমাধান অসম্ভব। উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যাপারে পৌরসভাগুলিকে বৃহত্তর আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। গোটা বৃহত্তর কলকাতা নিয়ে বোম্বাইয়ের মত একটি পৌরসভা গঠিত হলে অবশ্য পৌরসভা কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে পারত।

কলকাতার উন্নয়নের জন্য এখনও পর্যন্ত যে-কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, নতুন লোক যাতে কলকাতা শহরে এসে ভিড় না করে সেজন্য আসানসোল – দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও হলদিয়া অঞ্চলকে কলকাতার কাউন্টার ম্যাগনেট হিসাবে উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে।* দুই, কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য বস্তি-উন্নয়ন, কলকাতা-পৌর এলাকার

---

* আসানসোল-দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হলদিয়ার সঙ্গে ১৯৭২ সনে সাঁওতালদি, ফরাক্কা, খড়গপুরও যুক্ত হয়েছে।

বাইরে কোনা, সোনারপুর, লবণ-হ্রদ প্রভৃতি এলাকায় উপনগরী সৃষ্টি, মহানগরীর মধ্যে ফাঁকা জায়গা পেলে সেখানে নতুন বাড়ি তৈরি, পরিবহণ সমস্যার সুরাহার জন্য দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ, কসবা ব্রিজ ও চেতলা ব্রিজ তৈরি ছাড়া শহরের রাস্তা মেরামত ও চওড়া করা, হাওড়া স্টেশনে নতুন ট্রাফিক পয়েন্ট তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জলনিকাশী ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী স্থাপন ও পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি প্রকল্পের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ফরাক্কা প্রকল্পের কাজ শেষ হলে হুগলি নদীতে জলের গভীরতা বাড়বে এবং তখন বড় জাহাজগুলি কলকাতা বন্দরে ভিড়তে পারবে। ফলে কলকাতা বন্দরে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণও বাড়বে। সি-এম-পি-ও ১৯৬৫ সনে কলকাতার উন্নয়নের জন্য ৯৯ কোটি টাকা এবং আসানসোল এলাকার জন্য ১ কোটি টাকার পরিকল্পনা রচনা করে। ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত যোজনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৫০ কোটি টাকার কর্মসূচী অনুমোদন করেছিলেন। এখন শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার জন্য চতুর্থ যোজনাকালে ১৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে পারেন।*

রাজ্য-ভিত্তিক সামগ্রিক কর্মসূচীর অভাব

এখন প্রশ্ন কলকাতার উন্নতির জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে, তাতে কি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তি পাবে? এই প্রবন্ধের প্রথমেই এক নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, বৃহত্তর কলকাতায় কেবল এ-রাজ্যের মফস্বল এলাকার লোক নয়, প্রতিবেশী রাজ্যের লোকও এসে ভিড় করে। বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের লোকেরাও এসে ভিড় করে থাকে। কোন আইন করে ভিন্ন রাজ্য থেকে লোকের আগমন বন্ধ করা যায় না। প্রতিবেশী রাজ্যে শিল্প এবং কৃষির উন্নয়ন হলে এ রাজ্যে লোক আসা এমনিতেই কমে যাবে। দুর্গাপুর-আসানসোল

---

* ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কলকাতার জন্য কোনো টাকা পাওয়া যায়নি। ১৯৬৯-৭০ সালে পাওয়া যায় ৪ কোটি টাকার মতো, ১৯৭০-৭১ সালে ১৪ কোটি টাকা এবং চতুর্থ যোজনাকালে (১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭৩-৭৪) মোট ১৫২ কোটি টাকা।

বা শিলিগুড়ি এলাকায় বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের আগমন হ্রাস করতে হলে পশ্চিমবঙ্গকে ঐসব রাজ্যে কৃষি-উন্নয়ন ও শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ জোগাতে হবে। প্রতিবেশী রাজ্য চতুর্থ যোজনায় বেশী টাকা পাচ্ছে বলে বাঙালীদের চোখ টাটালে কলকাতার এবং পশ্চিম-বঙ্গেরই ক্ষতি হবে। আবার, এ-রাজ্যে আঞ্চলিক পরিকল্পনার অভাবে বৃহত্তর কলকাতার সঙ্গে অন্যান্য জেলার জনপ্রতি আয়ের বৈষম্য কমছে না এবং এটা না কমলে অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কলকাতা আসা বন্ধ করা যাবে না। দুর্গাপুরে ও আসানসোলে কারখানা স্থাপন করে লোক আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলকে একটি পূর্ণাঙ্গ শহরাঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা হয়নি। ওই এলাকার লোকদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারি, সবজি, কলা, ডিম,মাছ-মাংস,দুধ দরকার। চারপাশের কৃষি এলাকায় ঐসব কৃষি-পণ্য উৎপাদনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। গ্রামে চাষীর হাতে টাকা গেলে গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য ব্যবসারও প্রসার ঘটত। দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকায় নতুন উপনগরী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রচুর নতুন রাস্তা তৈরির দরকার ছিল, দরকার ছিল জি-টি রোড ছাড়া বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সংযুক্তির জন্য অনেকগুলি রাস্তার। এই সঙ্গে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা হলে গ্রামে ক্ষুদ্রশিল্পও গড়ে উঠতে পারত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দিতে পারলে অনেকে বাড়িতে থেকেই ওইসব কারখানায় কাজ করত এবং তখন ঐসব শ্রমিকের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে টাকা খরচ হত না বা উপযুক্ত বাসগৃহের অভাবে শ্রমিকদের জন্য নতুন বস্তি গড়ে উঠত না। হলদিয়ার ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। হলদিয়া উপনগরীতে বর্তমানে বন্দর, তৈলশোধনাগার, সার-কারখানা ও অন্য একটি পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করেও হলদিয়াতে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য জমি মিলছে না। হলদিয়াতে শিল্প-উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করবেন রাজ্য সরকার, অথচ রাজ্য সরকার নিজে জমির দখল নিয়ে তা কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পন করেছেন। হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে গোটা মেদিনীপুর এবং নদীর পূর্ব পারে কাকদ্বীপ ডায়মণ্ডহারবার, নূরপুর, ফলতায় ব্যাপক আকারে ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের এবং কৃষি-জাত দ্রব্য, মাছ, ডিম, মাংস ও দুধের উৎপাদন বাড়ানোর কর্মসূচী নেওয়া যেত। একমাত্র এইভাবেই গ্রামের উদ্বৃত্ত কর্মপ্রার্থীর কলকাতামুখী প্রবণতা

বন্ধ করা সম্ভব। হলদিয়াকে কেন্দ্র করে সুন্দরবন এলাকার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যেত এবং তখন সুন্দরবনের চাষী পরিবারের লোকদের দক্ষিণ-কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে এসে ভিড় করার বর্তমান ধারা হ্রাস করা সম্ভব হত। প্রচুর সংখ্যক যন্ত্রচালিত নৌকো বা লঞ্চের সাহায্যে এবং সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় পর্যটন-কেন্দ্র স্থাপন করে একদিকে পর্যটনের প্রসার ঘটানো এবং অপর দিকে দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থার কল্যাণে সুন্দরবনের উৎপন্ন ফসল বিক্রি করা সম্ভব হবে এবং চাষীরা তখন ফসলের জন্য বেশী দামও পাবে। থাইল্যাণ্ডের শ্যাম উপসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে এইভাবেই দ্বীপবাসীদের আয় বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ফরাক্কার ফীডার ক্যানেল দিয়ে জলপ্রবাহ আসতে আরম্ভ করলে নদীপথে কলকাতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বিহারের অংশ বিশেষের যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং একথা মনে রেখেই লোকসভার এষ্টিমেট কমিটি৯ ফরাক্কায় একটা অভ্যন্তরীণ বন্দর স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন পরিকল্পনায় ফরাক্কার স্থান এখনও মেলেনি। বর্তমান সঙ্কট ও কলকাতার সমস্যার জটিলতা হ্রাসের জন্য মহারাষ্ট্র, গুজরাত, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের মতো গোটা রাজ্যের জন্য অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। মহারাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন এলাকার জন্য আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা গঠন করেছেন। গুজরাতে প্রতি জেলা-সদরে ডেয়ারি স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করে চারপাশের গ্রামাঞ্চলে আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। গুজরাটের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (জি আই ডি সি) ১০ হাজার লোক পিছু একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটস গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন এবং ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১৭টি জেলায় ৬০টি কেন্দ্রে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটসগুলি স্থাপিত হয়েছে।১০ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটসগুলি সেখানে এমন জায়গাতেই স্থাপিত হয়েছে যেখানে কর্মীদের যাতায়াতের ও কারখানার মাল পরিবহণের সুবিধা আছে। গুজরাত শিল্প বিনিয়োগ সংস্থা (জি আই আই সি) শিল্প উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে মিলিতভাবে নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য ঋণ দিচ্ছেন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মত গুজরাতের নয়টি অনগ্রসর জেলাকে 'অনগ্রসর এলাকা' বলে ঘোষণা করে সর্বভারতীয় সংস্থার নিকট থেকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ সংগ্রহের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার অসুবিধা সৃষ্টি হলে রাজ্য সরকারের শিল্প-দপ্তর প্রতি মাসে ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

করে থাকেন। হরিয়ানা-পাঞ্জাবেও ঐ একই ব্যাপার দেখা যাবে। এই-ভাবেই ঐসব রাজ্য সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মূল ত্রুটিগুলি দূর করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামগুলি কেবল দূরবর্তী শহরের জন্ত কৃষি-উৎপাদন বাড়াবে না, গ্রামাঞ্চলের যে-সব কেন্দ্রে কোনো শিল্প স্থাপনের সুবিধা আছে,সেইসব এলাকায় শিল্প স্থাপন করে স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের পরিকল্পনা চালু হলে কেবল আসানসোল-দুর্গাপুর, হলদিয়া, শিলিগুড়ি নয়, রাজ্যের প্রতিটি শহর-এলাকা ও বাণিজ্য কেন্দ্র উন্নয়ন-কেন্দ্রে পরিণত হবে। গ্রামের শিক্ষিত বেকারও করবার মত কাজ পাবে, কলকাতার অনেক বেকার যুবক তখন কাজের সন্ধানে গ্রামাঞ্চলে যেতে পারবে। একমাত্র এইভাবে গ্রাম্য বেকারের সংখ্যা হ্রাস করে গ্রামাঞ্চলের বিক্ষোভ কিছুটা দূর করা যাবে, কলকাতার সঙ্গে জেলার জনপ্রতি আয়ের বৈষম্য কমানো সম্ভব হবে।

কর্মসংস্থানের জন্ত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের ব্যাপারে একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের অভাব। হরিয়ানা গত নভেম্বর মাসে প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করলেও এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত শতকরা মাত্র সাড়ে সাতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্ত জীবনবীমা সংস্থা অতীতে এ-রাজ্যকে টাকা দিয়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ কর্মসূচীর জন্ত অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৯ সনে প্রধানত পি এল ৪৮০ তহবিলের টাকায় ১৫০ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে গ্রাম্য বৈদ্যুতীকরণ সংস্থা গঠন করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তাতে দিল্লি মাত্র ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে পেরেছে। উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের অভাবে কোন বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত স্থাপন করা যায়নি, কোন হিমঘরও তৈরি হতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের কাঠচেরাই কারখানা ও চা-প্রোসেসের কাজও চালু রাখা যাচ্ছে না। জলঢাকার কথা বলে উত্তরবঙ্গে নতুন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবকে চাপা দেওয়া হয়েছে। দিশেরগড়ে পূর্বে-ব্যবহৃত ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রটি শিলিগুড়ি বা ডালখোলা নিয়ে গিয়ে চালু করা হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে ঐ এলাকার লোকদের জন্ত নূতন কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে, কৃষিও অনেক বেশী লাভজনক হবে এবং নিম্নবঙ্গের লোকেরাও তখন উত্তরবঙ্গে কাজ পাবে।

কলকাতার ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচী

প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে এবং বৃহত্তর কলকাতা বাদে অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের উন্নয়ন-কর্মসূচী গ্রহণের কথা বলা হল, সেগুলি কার্যকর হলেও বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা বাড়বেই। কতটা বাড়বে, তা ঐ কর্মসূচী রূপায়ণের উপরেই নির্ভর করছে। কলকাতা পৌর এলাকার অতিরিক্ত ঘনবসতি কমাবার জন্য সি-এম-পি-ও এবং রাজ্য সরকার কিছু নাগরিককে পৌর এলাকার বাইরে নিয়ে যেতে চান। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কল্যাণী উপনগরী তৈরি করেছিলেন, বেহালার দক্ষিণে একটা স্যাটেলাইট টাউন তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। কলকাতার অনেক অধিবাসী শহরতলিতে নিজেদের চেষ্টায় বাড়ি তৈরি করেছেন। এখন লবন-হ্রদ এলাকা ছাড়া কোনা ও সোনারপুরে উপনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। কলকাতা মহানগরীতে ফাঁকা জায়গা পেলে আগের মতই রাজ্য সরকার সমবায় গৃহনির্মাণ প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাড়ি তৈরি হবে। আর বস্তির লোকদের আগের মত উচ্ছেদ করা হবে না, ঠিকা আইন সংশোধন করে লীজের জমিতে স্থাপিত বস্তির মালিকদেরও উচ্ছেদ করা হবে না। ১৯৬৯ সনের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার লীজ নেওয়া বস্তির মালিকদের ঐ জায়গায় পাকা বাড়ি তৈরির অনুমতি দিয়ে আইন পাস করেছেন। সি-এম-ডি-এ'র কর্তৃত্বে বস্তি অপসারণের বদলে বস্তি উন্নয়নের নামে বস্তিতে খাটা পায়খানার বদলে সেপটিক পায়খানা, কাঁচা নর্দমার বদলে পাকা নর্দমা, পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা চলেছে। বস্তি অপসারণের ব্যাপারে কলকাতায় আগে সম্পূর্ণ ভুল নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই ভুল নীতি সংশোধনে সচেষ্ট না হয়ে কলকাতার রাজনৈতিক দলগুলি বস্তি বজায় রাখাটাই রাজনৈতিক 'ইস্যু' করে ফেলেছে।* ঐসব দলের নেতারা গান্ধীজীর মতো কখনও বস্তিতে বাস করলে মহানগরীর ঐ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করতে সচেষ্ট হতেন বলেই আমার বিশ্বাস। অপরদিকে সি-এম-পি-ও'র মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা হিসেব কষে

---

* পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ১৯৭৫ সালে তামিলনাড়ুর বস্তি-অপসারণ প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কলকাতায় সি-এম-ডি-এর বস্তি উন্নয়ন বাবদ পুরো টাকাটাই জলে গিয়েছে বলে রায় দিয়েছেন। কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীকুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত।

দেখেছেন যে, বস্তির লোকদের নূতন বাড়িতে পুনর্বাসন দিতে হলে অনেক জায়গা এবং টাকা লাগবে। এই গরিব রাজ্যের পক্ষে তাই বস্তি-অপসারণে উদ্যোগী না হয়ে বর্তমান বস্তিগুলির পরিবেশ কিছুটা উন্নয়ন করা উচিত।

আমার মতে, কলকাতার সমস্যা সমাধানের নামে প্রথম থেকেই একটা ভুল নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এ দেশটা মার্কিন মুলুকের মতো নয় যে, লোকে মহানগরী থেকে ৩০ মাইল দূরে কেবল বসবাসের জন্য তৈরি একটি উপনগরীতে গিয়ে বাস করবে। সেখানে লোকে নিজেদের গাড়িতে করেই কর্মস্থলে যাতায়াত করে। কিন্তু এদেশে লোকজন কেবল গরিব নয়, রাস্তাঘাটের সংখ্যা খুবই কম। বসতির জন্য লোকে বৃহত্তর কলকাতায় শহরতলির রেলপথের দুই ধারেই জায়গা বেছে নিয়েছে। নতুন উপনগরী গড়তে হলে সেটাকে নতুন কর্ম-সংস্থান কেন্দ্র করেই তা গড়তে হয়। অথবা লোকে যেখানে নতুন বাড়ি-ঘর তৈরি করছে, সেখানে সমস্যা জটিল হওয়ার আগেই নগর-পরিকল্পনায় হাত দিলে একটি সুপরিকল্পিত উপনগরী গড়ে উঠতে পারে। ঐ উপনগরীতেও কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। কেবল বসবাসের জন্য উপনগরী স্থাপনের চিন্তা খুবই ক্ষতিকর এবং নিন্দনীয়। এই ধরনের চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে, কারখানা বা শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় মানুষ বসবাস করতে পারে না। কিন্তু ঠিক কারখানার পাশে বা শহরে নোংরা এলাকায় ভদ্রলোকরা বাস করতে না চাইলেও লোকে সেখানে বাস করে, নতুন নতুন বস্তি তৈরি করে অঞ্চলটিকে আরও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। ঐ ধরনের চিন্তার জন্য কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া অ্যাসিড মিশ্রিত জলে পরিবেশ দূষিত হওয়া সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকা যায়। তাই ঠিক কারখানার পাশেই শ্রমিকদের জন্য কোয়ার্টার তৈরি হতে পারে, বাবুদের কোয়ার্টার তৈরি হয় অপেক্ষাকৃত দূরে।

মহানগরীর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সরকার ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি করছেন, সেইসব এলাকার কর্মরত ব্যক্তিরা বসবাসের জন্য ঐসব ফ্ল্যাট পাচ্ছেন না। গড়িয়ার গাঙ্গুলিবাগানের সরকারী আবাসের আবাসিকদের প্রায় সকলেই কলকাতার কেন্দ্রস্থলে কাজ করতে আসেন, টাংরার হাউসিং এস্টেটের আবাসিকদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিই ঐ এলাকায় কাজ করেন। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বা সি আই টি ফ্ল্যাটগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এইভাবে বাসগৃহ সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় শহরের পরিবহণ ব্যবস্থার উপর চাপ পড়েছে। অথচ কোনো এলাকায় জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই এলাকায়

বাসের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে না। আবার যেখানে হাউসিং এস্টেট তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে নতুন আবাসিকদের প্রয়োজনের কথা ভেবে নতুন দোকান-বাজার, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোস্টাফিস, আবাসিকদের জন্য লাইব্রেরির ঘর বা কমিউনিটি রুমের জন্ত বাড়ি তৈরি হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই কামরার ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের কাপড়-চোপড় রোদে, দেওয়ারও ব্যবস্থা নেই। এই সব ফ্ল্যাট কাদের জন্ত তৈরি করা হয়েছিল? মানুষের জন্ত? জন্তুদের থাকার জায়গাতেও রোদের দরকার হয়। মানুষ যে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং নতুন পরিবেশে সামাজিক আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার, রাজ্য সরকারের গৃহনির্মাণ-বিশারদদের চিন্তায় তা এখনও স্থান পায়নি।

কলকাতায় বস্তিগুলি বাঁচিয়ে রাখার অর্থই হল, শহরের মধ্যে এই অস্বাস্থ্যকর কেন্দ্রগুলি থাকবে এবং উন্নত বাসগৃহএলাকার অধিবাসীরা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে বাস করে কাজের জন্য শহরের কেন্দ্রস্থলে আসবে। এই মহানগরীতে বস্তিবাসীরা কী ধরনের অমানুষিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করছেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তিতে পাকা পায়খানা হলেও আগের মত ভবিষ্যতেও বস্তির বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েকে নর্দমায় মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে। কাজেই নর্দমা পাকা হলেও দুঃসহ অবস্থা দূর হচ্ছে না। শহরের অন্যত্র ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি হলেও বস্তি এলাকা থেকে মশা মাছির দৌরাত্ম কমছে না। বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত পরিবেশে পড়াশুনা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। বস্তি-উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যকর হওয়ার পরেও পরিবেশের এমন পরিবর্তন হচ্ছে না, যাতে লোকে রাস্তায় শোভাযাত্রার বদলে বাড়িতে বসে গঠনমূলক আলোচনার তাগিদ অনুভব করতে পারে। একথা ঠিক যে, বস্তিবাসীদের জন্য ভাল বাড়ি তৈরি করলেও তারা সেখানে যেতে চায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বাসস্থান কর্মস্থল থেকে দূরে বলে। বস্তির লোকেরা সাধারণত আশে পাশে কাজ করে থাকে। তাই নূতন এলাকায় যাওয়ার কথা বললে তারা অন্য বস্তিতেই আশ্রয় খোঁজে। তৃতীয়ত, বস্তি মানসিকতা বলে একটা জিনিস আছে। এদের অনেকে নতুন বহুতলার বাড়িতে গিয়েও সেটাকে বস্তি করে তুলবে নতুবা নতুন ফ্ল্যাটের দখল নেওয়ার পর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে আবার বস্তিতে ফিরে যাবে। দিল্লিতে

ভিক্টোরিয়াটিক এনক্লেভের পাশে ২৮৮ ফ্ল্যাটের 'বাপুধাম' তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ধাঙড়েরা সেখানে বসবাস না করে মাসিক ৬০ টাকা ভাড়ায় ভদ্র-পরিবারের লোকদের বসবাস করতে দিচ্ছে।১১ কয়েক বছর আগে থাই সরকার ব্যাঙ্ককের ডিংডং রোডে শহরে সর্বনিম্ন আয়ের লোকদের জন্য কয়েক হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করেছিলেন। ফ্ল্যাটের দখল নিয়ে কিছু টাকা রোজগার করে সর্বনিম্ন আয়ের লোকেরা পুনরায় নোংরা বস্তিতে ফিরে গিয়েছে। তারা পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নতুন পরিবেশের খাপ খাওয়াতে পারে না। তারা পরিচ্ছন্ন বাড়ি, উন্নত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজের অন্য শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বলে ভেবে এসেছে, এই মানসিকতা কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন। এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা এক সিঙ্গাপুরেই হয়েছে। বস্তির লোকদের ধরে নিয়েই নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে বসানো হয়েছে। শহরের সর্বত্রই বস্তি ধরনের বাড়ি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কাজেই বস্তিতে ফিরে যাওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

সি-এম-পি-ও রচিত কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হাতে টাকা দিলেও কলকাতা সমস্যার জটিলতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বাসগৃহের কথাই ধরা যাক। ১৯৬১ সনে বৃহত্তর কলকাতার গৃহহীন পরিবারের জন্য প্রতি পরিবারে দুটি ঘরের হিসাবে মোট ৭ লক্ষ ৩০ হাজার ঘর দরকার। ১৯৬১ সনের হিসাব অনুসারে ১৯৬১ সন থেকে ১৯৮৬ সনের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতায় মোট ১৩ লক্ষ বাসগৃহ ইউনিটের দরকার হবে। কিন্তু গত দশকে বৃহত্তর কলকাতায় বছরে মাত্র ৬ থেকে ৯ হাজার ইউনিট তৈরি হচ্ছিল, যেখানে দরকার ছিল বছরে ৫৩ হাজার নতুন ইউনিটের।

সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা

কলকাতার বাসগৃহ, পরিবহণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা পানীয় জলের সমস্যা এবং কলকাতার নাগরিকদের সব কিছু ধ্বংস করার মানসিকতা দূর করতে হলে কলকাতায় "আরবান রিনিউয়াল" বা পুরানো বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে সেখানেই নতুন বাড়ি তৈরির ব্যাপক কর্মসূচী নিতে হবে। এলাকার পুরানো বাসিন্দারা নতুন বাড়িতে স্থান পেলে আগের মতোই রাজনৈতিক ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। ব্যাঙ্কক, ম্যানিলা এই জাতীয়

কর্মসূচীকে একেবারেই অবহেলা করেনি। কিন্তু নতুন শহর ও বাসগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে সিঙ্গাপুর এখন সারা পৃথিবীর আদর্শ। একই সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুরানো বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেলে বিভিন্ন আয়ের লোকদের জন্য দশ-তলার ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এক একটি হাউসিং এলাকায় পাঁচ লক্ষের মতো লোক বসবাস করতে পারে। ফ্ল্যাটগুলি এক, দুই ও তিন কামরার। লোকের আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে কোন ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হয়, কোন ফ্ল্যাট বিশ-বছরের কিস্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে। ১৯৭০ সালে সিঙ্গাপুরে প্রতি ৩৩ মিনিটে একটা নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। গোটা এলাকা নিয়ে বাসগৃহ নির্মাণের কর্মসূচী চালু হওয়ায় লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া দোকান-বাজার, স্কুল, থানা, পোস্টাফিস, গীর্জা, খেলার মাঠের জন্য প্রচুর ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও ছোটখাট কারখানা স্থাপনের জন্য জমিও রাখা হচ্ছে। বাতাস নির্মল রাখার জন্য ফাঁকা জায়গার সঙ্গে নতুন গাছপালা সৃষ্টির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বহু ফ্ল্যাটবাড়ির নীচেরতলা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান,ব্যাঙ্ক প্রভৃতিকে বেশী হারে ভাড়া দিয়ে উপরতলায় অপেক্ষাকৃত কম-ভাড়ায় লোক বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। একদিকে দোকান-ঘর, অপর দিকে উপরে উঠবার সিঁড়ি থাকায় বহু ফ্ল্যাটবাড়িতে 'ব্যাক্-সাইড' রাখা হয়নি। অনেক জায়গায় ঠিক বাজারের মধ্যেই কয়েকটি দশ তলার বাড়ি তুলে দোকানদার ও দোকানের কর্মীদের ওখানেই বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে কর্মীদেরও সুবিধা হয়েছে, শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় চাপও হ্রাস পেয়েছে। অবস্থাপন্ন পরিবারের লোকদের নিকট সরকার অপেক্ষাকৃত বেশী দামে জমি বিক্রি করেছেন। ১৯৭০ সালে সিঙ্গাপুরের ফুটপাথের দোকানদারদের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করে ফুটপাথের দোকান তুলে দেওয়া হয়েছে।

কয়েকটি প্রস্তাব

কলকাতা শহরে সিঙ্গাপুরের ধরনে কর্মসূচী গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম বাধা পৌরসভা। পৌরসভার করব্যবস্থা বস্তি ও মান্ধাতা আমলের বাড়ির বদলে নতুন বাড়ি তৈরি করতে উৎসাহ দেয় না। বাড়ি যত পুরানো হবে, পৌরসভার করও তত কমবে। এজন্য সম্পত্তি-কর বাবদ কলকাতা পৌরসভার আয় বাড়ছে না। ভিয়েনা পৌরসভায় বাড়ি বেশী পুরানো হলে পৌরকর

বেশী দিতে হয়। কলকাতার পৌর এলাকায় ৪ হাজার একর জমি পচা পুকুর, ডোবা ও অব্যবহার্য জমি হিসাবে পড়ে থাকলেও পৌরসভা বাড়ি তৈরির ব্যাপারে নাগরিকদের বাধ্য করতে পারেন না। দ্বিতীয় বাধা, ভাড়াটে ও বস্তিবাসীরা। যখনই কোথাও নতুন বাড়ি তৈরির চেষ্টা হয়, ভাড়াটেরা উঠতে চান না, আদালতের শরণ নেন। ভাড়াটে বা বস্তিবাসীদের স্বার্থের সঙ্গে শহরের এলাকায় বা কোন বিশেষ ঠিকানায় নতুন বাড়ি তৈরির সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি না হওয়ায় তারা নিজেদের দখল ছাড়তে অস্বীকার করে থাকেন। বিদেশের অনেক শহরে পুরানো ভাড়াটেদের উচ্ছেদ না করে তাদের নিকট থেকে নতুন বাড়ির জন্য আগাম ভাড়া নিয়ে বাড়ি তৈরি করা হয়। তৃতীয় বাধা, লোকের পুরো বাড়ির মালিক হওয়ার প্রবৃত্তি। শহর-এলাকায় জমির দাম বেশী, শহর ও নাগরিকদের স্বার্থেই এখানে বহুতলাবিশিষ্ট বাড়ি হওয়া দরকার এবং লোকে এখানে ফ্ল্যাটের মালিক হবে, পুরো বাড়ির নয়। মহারাষ্ট্র সরকার ফ্লাট কেনার জন্য ঋণ দিয়ে বৃহত্তর বোম্বাইতে ফ্ল্যাটের মালিকানা-প্রথা চালু করেছেন। জীবন বীমা সংস্থাও এখন ফ্ল্যাট কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আইন সংশোধনে আগ্রহী। মহারাষ্ট্র সরকার একটি এলাকা বস্তি-অঞ্চল বলে ঘোষণা করে পুরো এলাকার উন্নয়নের জন্য একটা আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছেন১২ এবং রাজ্যের অন্য বড় শহরে এক-তলা বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ করেছেন। কলকাতাতেও এইভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকার পুরানো বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে বিভিন্ন আয়ের লোকদের জন্য বহুতলা-বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে ঐ এলাকার পুরানো ভাড়াটেদের প্রথমে ফ্ল্যাট বেছে নিতে দিতে হবে। বাড়ির মালিকদের ফ্ল্যাটের মালিকানা দিতে হবে। সে ফ্ল্যাটও তাঁরা বেছে নেবেন এবং দরকার হলে বাড়ি তৈরির সময় তদারকির ব্যাপারেও তাদের রাখা যেতে পারে। শহরকে এইভাবে ঢেলে সাজালে এলাকার লোকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা যাবে, কলকাতার মধ্যে কর্মস্থলের কাছাকাছি অনেক বেশী লোক বসবাস করতে পারবেন, শহরের মধ্যে আরও প্রশস্ত রাস্তা, খেলাধূলার জায়গা রাখা ও গাছপালা সৃষ্টি করা যাবে, মশার উপদ্রবও কমবে। পৌরসভার সম্পত্তি-করও বৃদ্ধি পাবে। অনেকে দেশে ইস্পাত, সিমেন্ট, লিফট প্রভৃতির অভাবের কথা বলতে পারেন। কিন্তু দিল্লি ও বোম্বাই স্কাই-স্ক্রাপার তোলার ব্যাপারে যদি সব জিনিস পেতে পারে, কলকাতাই বা পাবে না কেন?

আরবান রিনিউয়াল কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যাপারে একটি বড় বাধা কলকাতায় বর্তমানে এ ধরনের কোন পরিকল্পনার অভাব। একমাত্র চৌরঙ্গী-নিউমার্কেট এলাকার উন্নয়নের জন্য সি-এম-পি-ও এই জাতীয় পরিকল্পনা রচনায় হাত দিয়েছিল। ১৯৬৮ সনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সি-এম-পি-ওকে চিঠি না দিলে এ চেষ্টাও হত না। পরিকল্পনা-রচয়িতাদের কাজ তদারকির সঙ্গে জড়িত রাখতে পারলে সি-এম-ডি-এ'র অনেক প্রকল্পই দ্রুত কার্যকর করা সম্ভব হত। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সি-এম-পি-ও'র পরিকল্পনাকারীদের বেশীর ভাগই এখন দেশছাড়া।

কলকাতা শহরের জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকর করার কথা বলা হল, শহরতলি ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহর-এলাকা সম্পর্কেও সে-কথা প্রযোজ্য। সর্বত্রই বহুতলা-বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ি, নতুন রাস্তাঘাট, বাজার, পার্ক, শিক্ষায়তন তৈরির কর্মসূচী নিলেই নতুন নতুন বাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং তাতে পৌরসভাগুলির আয়ও বৃদ্ধি পাবে। দিল্লিতে বাসগৃহ-নির্মাণের জন্য যে রিভলভিং ফাণ্ড তৈরি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তা আজও হয়নি। জীবনবীমা সংস্থা বাজার ও অন্যান্য লাভজনক বাড়ি তৈরির ব্যাপারে ঋণ দিলেও পশ্চিমবঙ্গে ঐ ঋণের সুযোগ তেমন গ্রহণ করা হয়নি। প্রস্তাবিত নিউ মার্কেট প্রকল্পে টাকা দিতে চাইলেও পৌরসভা ও ব্যাপারে এখনও উদ্যোগী হননি। শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে বাড়ি তৈরির জন্যও জীবনবীমা সংস্থার বর্তমান বাসগৃহ নির্মাণের ঋণদানের নীতি বদলানো দরকার।

এখানে কলকাতায় আরবান রিনিউয়ালের উপরে ইচ্ছা করেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হল। কারণ একবার ভিন্নভাবে ভাবতে শিখলে অন্যান্য কর্মসূচীর ভুলগুলিও ধরা পড়বে। যেমন, কলকাতায় পাতাল-রেল হলেও পার্কসার্কাস থেকে মৌলালী বা ময়দান কিংবা ভবানীপুর-কালিঘাটের লোকদের গড়িয়াহাট বা বণ্ডেল রোড, বেলেঘাটার লোকদের মানিকতলা বা জোড়াসাঁকোতে যাওয়ার জন্য প্রচুর সংখ্যক স্কুটার, ট্যাক্সি, ছোট ছোট বাস এবং ম্যানিলার অনুকরণে ১০।১২ জন বসতে পারে 'জিপনের' মত কোন ছোট যানবাহন দরকার হবে। এ ধরনের পরিবহণ চালু হলে শহরের অনেক যুবকও কাজ পাবে। তাই কেবল পাতাল-রেলের কথা বলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও বস্তির মানুষের মনে কোন আশাই জাগানো যাবে না।

বাঙালী মধ্যবিত্তের মানসিক গঠন

কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধা কিন্তু কলকাতার বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা কিন্তু এক থাকছে না, নতুন যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হচ্ছে, তারাও নতুন শ্রেণী-চরিত্র লাভ করছে। স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মধ্যবিত্তদের গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গ বলতে তারা কলকাতা ও নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। এদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবও পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পথে বড় বাধা। বাঙালী মধ্যবিত্ত অফিসে ও কারখানায় কাজ করবে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে তাদের কোন দায়িত্ব নেই, সব দৃষ্টি মাহিনা, বোনাস ও ওভারটাইমের দিকে। বাঙালী মালিকরাও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীন। বাঙালীর হাতে পড়ে কলকাতার সরকারী বাস ও দুগ্ধ-প্রকল্প লোকসান দিচ্ছে কিন্তু আমেদাবাদে পৌরসভার হাতে দুটিই লাভ-জনক ব্যবসা। রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থা ও দুর্গাপুর প্রকল্পে ঐ একই ব্যাপার দেখা যাবে। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী দীর্ঘদিন যাবৎ মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে ভাবতে শিখেছে যে, অফিসে কারখানায় কাজ করলেই মালিকের শোষণ বাড়াতে সাহায্য করা হয়। যে-প্রতিষ্ঠান থেকে সে মাসে মাসে মাহিনা নিচ্ছে সে-প্রতিষ্ঠানটি টিঁকিয়ে রাখা ও সম্প্রসারণের ব্যাপারেও তার দায়িত্বের কথা মনে রাখে না। সরকারী অফিসে কর্মী ও অফিসারদের মধ্যেও ঐ একই জিনিস দেখা যাবে। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পাঞ্জাবে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও ঝড় ঝাপটা অনেক বেশী ছিল। পাঞ্জাবের বিপুল উন্নতির মূলে আছে জাতি হিসাবে পাঞ্জাবীদের কর্মক্ষমতা, যা সরকারী স্তরেও প্রতিফলিত।

কলকাতার বাঙালী বুদ্ধিজীবী একই সঙ্গে অনেকগুলি ধাপ্পার উপর টিঁকে আছে। এঁরা দাবি করে থাকেন, বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা প্রগতিশীল, দৃষ্টিভঙ্গী খুবই উদার, প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত এবং সমাজ সম্পর্কে সচেতন।

বাঙালী মধ্যবিত্ত কলকাতার অ-বাঙালীদের বিরুদ্ধে মারমুখী নন, রাজ-নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাদের নিয়ে আন্দোলনও করে থাকেন। কিন্তু বাঙালীরা অ-বাঙালীদের সমাজজীবন সম্পর্কে একেবারেই নির্লিপ্ত। কলকাতা কসমোপলিটান শহর। ১৯৬১ সনের আদমসুমারি অনুসারে এই শহরের শতকরা ৬৩.৯৪ জন বাঙালী, ১৯.৩৪ জন হিন্দীভাষী, ৮.৭৮ জন উর্দু-ভাষী ২.১০ জন ওড়িয়া। বাঙালী ছেলেমেয়েদের মতো অন্য ভাষাভাষীরা এই

শহরে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ পৌরসভা বাঙালীদের হাতে। এটাকে কী করে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ বলা যায়? বাংলাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা করার আইন পাস হয়েছে কিন্তু এ-রাজ্যের অবাঙালী ছাত্রদের বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ফলে অতি সহজেই একটি গোষ্ঠী প্রতি-যোগিতা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। কসমোপলিটান শহরে বিভিন্ন আয়ের বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষীর গোষ্ঠীকে নিয়ে কলকাতায় নতুন সমাজ গড়ার কোন প্রচেষ্টা বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে নেই। সিঙ্গাপুরে তামিল, চীনা, মালয়ী ও ইংরেজী ভাষার পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে একই বিষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করে সকলকে একসূত্রে গাথার চেষ্টা হচ্ছে। কলকাতায় এ ব্যাপারে কেউ চিন্তাই করেন না।

রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে উদারনৈতিক ভাবধারা দেখা যায়, তা তৎকালীন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজে কেন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, প্যান-ইসলামের ঢেউ বাঙালী মুসলমানকে বাঙালী হিসাবে ভাবতে কেমন করে বাধা দিল, তার কোন বিশ্লেষণ কলকাতার বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এখনও করতে পারেনি।* তথাকথিত শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার প্রবাহকে চাপা দিতে চেগেছে। বাঙালী মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্লাবন দেখা যাচ্ছে এটাকেও সমাজ সচেতনতা বলা যায় না। ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবাদের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য ইংরেজরা এদেশে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল। আন্দামানে, দেউলিতে এবং অন্যান্য জেলে অতি সহজেই মার্কসবাদের বই পাওয়া যেত, বন্দীরা অন্য ধরনের বই সহজে বা একেবারেই পেতেন না। জর্জ অরওয়েল ১৯৪৩ সনের মে মাসের পার্টিসান রিভিউতে লিখেছিলেন যে, ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রীদের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য শাসক শ্রেণী কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল এবং ১৯৩৫ সাল থেকে ক্যাপিটালিস্ট প্রেসই কম্যুনিস্টদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে[১৪]। ইংলণ্ডের একদল বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদী হয়েছিলেন, তাই কলকাতার একদল বুদ্ধিজীবীও মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরা সত্যি সত্যিই মার্কসবাদ

---

* দুই বছর আগে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমান সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় জাগরণ সম্পর্কে গবেষণা মূলক বই লিখেছেন ডঃ অমলেন্দু দে। বইটির নাম—বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ।

গ্রহণ করলে গ্রামের চাষীদের সংঘবদ্ধ করতে গ্রামে চলে যেতেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে রুশপন্থী কম্যুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করে জর্জ অরওয়েল, স্টিফেন স্পেণ্ডার বা রাশিয়া সম্পর্কে মোহ-হীন আর্থার কোসলার, আঁদ্রে জিদ, সিলোনে প্রভৃতি যা লিখেছিলেন, ইংলণ্ডের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাগজে তা স্থান পায়নি। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বর্তমান পেঙ্গুইন-সংস্থা দেশে দেশে মাও, হো-চি-মিন, গুয়েভারা, কাস্ট্রোর জীবনী ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহদানকারী বই সস্তায় লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি করছে। যে গুয়েভারা নিজের চেষ্টায় জীবনে কোন সাফল্যলাভ করেননি, কোন সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দেননি এবং কিউবার অর্থনীতিকে পথে বসিয়েছেন বলে কিউবা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, পেঙ্গুইন সিরিজের কল্যাণে সেই গুয়েভারা এখন সারা পৃথিবীর তরুণ সমাজের আদর্শ। পেঙ্গুইন কিন্তু গুয়েভারা অপেক্ষা অনেক বেশী সাফল্যের অধিকারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কোন বই বের করেনি, পণ্ডিত নেহেরু, এশিয়ার অন্যান্য গণতান্ত্রিক নেতা ও তাঁদের সাফল্যের কথা বাইরের পৃথিবীকে জানায়নি। পর পর দুটি আঙ্কটাড সম্মেলনে উন্নতদেশগুলির সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলি পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলি মিলিতভাবে উন্নত দেশগুলিতে বিনা বাধায় অনেক বেশী পণ্য রপ্তানির দাবি করেছে, জাহাজের মাশুল কমাতে চেয়েছে, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে। অনগ্রসর দেশগুলিতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বাড়াতে পারলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে, উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাদের দর কষাকষির ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। পেঙ্গুইন সংস্থার মালিকেরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের উন্নতি চায় না। কেবল ভারত-বিরোধী সেগল ও রাসেলের বই দুটি প্রকাশই তার প্রমাণ। কলকাতার বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ যে এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার, এই মুহূর্তে তাঁরা তা বুঝতে পারছেন না। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক প্রচারের শিকার হওয়ায় বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই একদিকে তাকে চিন্তার দৈন্য সম্পর্কে সজাগ করা এবং অপর দিকে বৃহত্তর কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যকর করার মাধ্যমে বাঙালী মধ্যবিত্তকে মোহগ্রস্ত জগৎ থেকে বাস্তবে নিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে দুটি কাজ করতে উদ্যোগী হলেই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গকে বর্তমানের শোচনীয় ও অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে সুস্থ জীবন-

যাত্রার জগতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

পাদটীকা

১। বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, ১৯৬৬-১৯৮৬। সি-এম-পি-ও। পৃঃ ১।

২। রিজিওন্যাল প্ল্যানিং ফর আরবানাইজেশান ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া—লিও জ্যাকবসন। সি-এম-পি-ও। পৃঃ ২৩।

৩। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে। সংখ্যা ৫৩।

৪। আলোচনার সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধে ১৯৬১ সনের আদমসুমারির পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। বড়বাজার ইমপ্রুভমেন্ট (এ রিপোর্ট)। অধ্যাপক প্যাট্রিক গেড্ডেস। কলকাতা পৌরসভা। ১৯১৯।

৬। শচীন চৌধুরী : ইকনমিক প্ল্যানিং অ্যাণ্ড সোশ্যাল অরগানিজেশান. (বোম্বে)। পৃঃ ১৩৩—১৪০।

৭। বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান—পৃঃ ৩০।

৮। বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান। পৃঃ ৩২।

৯। এস্টিমেট কমিটী (১৯৬৮-৬৯)। চতুর্থ লোকসভা। ৭৪তম রিপোর্ট। এপ্রিল, ১৯৬৯।

১০। গুজরাট'স ইকনমি—ইকনমিক টাইমস। মার্চ ১৯, ১৯৭১।

১১। টাইমস অব ইণ্ডিয়া (দিল্লি), মার্চ ১৫, ১৯৭১।

১২। বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান—পৃঃ ২৮।

১৩। মহারাষ্ট্র স্লাম এরিয়াজ (ক্লিয়ারেন্স অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট) বিল, ১৯৭০

১৪। "In Britain, at any rate, there has been little sign in the past dozen years that the ruling class seriously objected to the existence of the communist party···At all other times from 1935 onwards it has had powerful support from one or other section of the capitalist press. A thing that it is difficult to be sure about is where the communists get their money from······they are helped from time to time by wealthy English people who see the value of an organisation which acts as an eel-trap for active socialists. Beaverbrook for instance is credited, rightly or wrongly with having financed the communist party during the past year or two". —Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell—Vol. 2. P. 329.

[দেশ, ১১ আষাঢ়, ১৩৭৮]

৭

বেকার সমস্যার প্রকৃতি ও কাজের সুযোগ

ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই যে বেকার সমস্যা সবচেয়ে বেশী, সে বিষয়ে সকলেই একমত। তবে একমত নন, বেকারের সঠিক সংখ্যার হিসাব নিয়ে। কর্মসংস্থান কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ২৮ লক্ষ। কাজ না পাওয়া বহু বেকার কর্মসংস্থান কেন্দ্রে একেবারেই বা এক-দুই বারের বেশী নাম লেখান না। মফস্বলের শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট বেকাররা অনেক সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরির খোঁজে থাকেন, পরিচিত লোকের মাধ্যমে চাকরির খোঁজ করেন। কিন্তু কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লেখানোর কথা ভাবেন না। তাই প্রকৃত বেকারের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ লক্ষের মধ্যে বলে অনেকেরই ধারণা। পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা আরও একটি কারণে জটিল। বিহার এবং ওড়িশার কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের নাম লেখানোর সুযোগ নেই। ফলে ওই দুটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিতেও এ-রাজ্যের বেকার-যুবকেরা প্রার্থী হতেই পারছে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় ও বেসরকারী সংস্থায় ভিন্ন রাজ্যের লোক হামেশাই কাজ পাচ্ছে। অবশ্য কল-কারখানা ও অফিসে কয় হাজার লোক নতুন চাকরি পায়? পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে এবং কৃষি-উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জিনিস, বাড়ি-তৈরির সরঞ্জাম, বেশীরভাগ ভোগ্যপণ্য ভিন্ন রাজ্য থেকেই আসে এবং এইসব দ্রব্যের বিক্রির ব্যাপারে ভিন্ন রাজ্যের লোকদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ি ও অন্যান্য কনস্ট্রাকশান কাজেও নিযুক্ত হচ্ছে ভিন্ন রাজ্যের লোক। কাঠের মিস্ত্রীর কাজে কলকাতার চীনা মিস্ত্রিদের পরেই পাঞ্জাবি মিস্ত্রির চাহিদা। কলকাতার বড় বড় বাড়ি ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের বাড়িতে জানালার কাঁচ লাগাতে দেখা যায় ওড়িশার লোকদের। গত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে কল কারখানার অবস্থা যা-ই হোক না কেন, পরিবহণ শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা কিন্তু বেড়েছে। বাস, লরি, ট্যাকসি ও টেম্পোর সংখ্যা

প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহণ শিল্পে অগ্রগতির তুলনায় রাজ্যের যুবকদের কাজ কিন্তু জোটে নি। অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, হরিয়ানায় রাজ্য সরকার গঞ্জে ও ছোট শহরে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ও ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে বা সাহায্য করে শহর ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। ওই সব রাজ্যে আবার ব্যাপকভাবে ডেয়ারি শিল্পের প্রসারের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের পক্ষেও গরু বা মোষ পুষে আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কেরল ও পশ্চিম উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে আবার সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপক প্রচেষ্টা চোখে পড়বে। এতে কেবল মৎস্যজীবীরাই উপকৃত হয়নি, মাছ-ধরার সরঞ্জাম তৈরি ও সরবরাহ, মাছ সংরক্ষণ, বিক্রির এবং রপ্তানির কাজেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কয়েক বছর আগেকার এক সমীক্ষায় জানা যায়, কেরলের সমুদ্রোপকূলের মৎস্যজীবীদের বার্ষিক আয় ১৯৫৩ সালের ৩২৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৮ সালে ১৮৮৬ টাকা হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে মৎস্যজীবীদের ঋণও শতকরা ৩৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। (ইকনমিক টাইমস, ২১ এপ্রিল, ১৯৭১)। কলকাতা ও পূর্বাঞ্চলের ভোগ্যপণ্যের বাজারের কথা মনে রেখে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে। কলকাতার বাজারে তৈরি পোষাক, নাইলনের জামা, হোসিয়ারি, তাঁতের কাপড়, সোয়েটার, এমন কী পেন্সিল, নেল পালিসও ওই সব রাজ্য থেকে আসে। ভিন্ন রাজ্যে তৈরি খাদির জিনিসের বড় বাজারও কলকাতা।

পাঞ্জাব-হরিয়ানা, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের প্রধান কৃষিপণ্য গুলির জন্য ও সমবায় সমিতির কল্যাণে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গম চাষীরা, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ও তামিলনাড়ুর তুলো চাষীরা এবং অন্ধ্রের তামাক চাষীরা ন্যায্য দাম পেয়ে থাকে। রাজ্যসরকারগুলির চাপে ওইসব রাজ্যে মাঝারি ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তি হয় লুপ্ত নতুবা দারুণ ভাবে হ্রাস পেয়েছে। কৃষকেরা ফসলের বেশী দাম পাওয়ায় কৃষকদের হাতে বেশী পয়সা যাচ্ছে এবং তাতে সামগ্রিক ভাবে ওইসব রাজ্যের উন্নতি ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য কর্পোরেশন ধান কিনলেও উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে কৃষকেরা দাম পায় না। এরাজ্যে গত বছর দশ লক্ষ টন গম হলেও কৃষকদের কম দামেই বাজারে উদ্বৃত্ত গম বিক্রি করতে হয়েছে। অবাঙালী চাকিওয়ালা সেই গম কিনে বেশী দামে আটা বিক্রি করে টাকা দেশে পাঠিয়ে দেয়। গত দু বছর সুন্দরবনে তুলোচাষ হলেও

ভারতের তুলো কর্পোরেশন এ-রাজ্য থেকে কোন তুলো কেনেনি। ফলে তুলো-চাষীদের হাতে তুলোর ন্যায্য দাম পৌছায়নি। সবচেয়ে কেলেঙ্কারির ব্যাপার ঘটছে পাট-চাষীদের ক্ষেত্রে। একুশটি অবাঙালী পরিবার পাটকল থেকে কাঁচা পাটের ব্যবসাও নিয়ন্ত্রণ করেছে। উৎপাদন খরচ অনুসারে কাঁচা পাটের দাম স্থির তো হয়ই না, যে-ন্যূনতম দাম স্থির হয় সে-দামেও কৃষকের ঘর থেকে পাট কেনার কোন ব্যবস্থা নেই।* অন্ধ্র সরকার সিগারেট কোম্পানিগুলিকে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ও গঞ্জে গুদাম তৈরি করে চাষীদের নিকট থেকে আগেই তামাক কিনতে বাধ্য করেছিলেন। ১৯৭২ সাল থেকে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনও কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি তামাক কিনতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতের তুলো কর্পোরেশনের পক্ষে সরকার নির্ধারিত দামে তুলো কেনার অসুবিধার জন্য মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্য সমবায় সংস্থার মাধ্যমে তুলো কেনার ব্যবস্থা করেছেন। ওই সব কৃষিপণ্য কেনার ব্যাপারে অনেক লোকের কর্মসংস্থান ছাড়া চাষীদের হাতেও বেশী পয়সা আসছে এবং সেই বাড়তি পয়সা রাজ্যে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন নীতিগতভাবে পাট কিনতে রাজী হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকের নিকট থেকে সরাসরি বেশী পরিমাণে পাট কিনতে বাধ্য করেন নি বা মহারাষ্ট্র সরকারের মতো সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে পাট কেনার ব্যবস্থা করেন নি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষি-পণ্যের দাম বাবদ টাকা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ভিন্ন রাজ্যে চলে যায় এবং তা কালো টাকায় রূপান্তরিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের কাজে লাগে না।

কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য নানা রকম ভরতুকি দিয়ে থাকেন, রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারীদেরও সাহায্য করেন। কিন্তু কৃষি-পণ্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় কোন নীতি আজও গ্রহণ করা হয়নি। ফলে আমদানি বন্ধ বা কমাতে কিংবা রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করেছে, এমন কৃষি পণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে কোন ভরতুকি প্রদান বা অর্থ সাহায্য করা—কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়নি। বিশেষ বিশেষ কৃষি-পণ্যের জন্য রাজ্যসরকারগুলির চাপের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার নতি

* মহাজন ও ফড়েদের হাত থেকে পাট চাষীদের বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৩ সনে জুট কর্পোরেশন গঠন করলেও কর্পোরেশনের ভূমিকা এখনও সীমিত।

স্বীকারের বদলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী কৃষি-পণ্যগুলির ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করলে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ হ্রাস পাবে এবং কৃষি-পণ্যের দামের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির অন্তত একটা পথ বন্ধ হবে।

॥ ২ ॥

ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা নির্ণয় এবং বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে এক কমিশন নিযুক্ত করেন। ওই কমিশন ভগবতী কমিশন হিসাবে পরিচিত। কমিশন বিভিন্ন রাজ্যে বিরাশিটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি-এম-পি-ও পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার প্রকৃতি ও তার সমাধানের পথ-নির্দেশ করে একটি স্মারকলিপি দেন। "আনএমপ্লয়মেণ্ট অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল" নামে এই স্মারকলিপিটি দেওয়া হয় ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে। সি-এম-পি-ও'র ডিরেক্টর কে বিশ্বাসের ভূমিকা থেকে বোঝা গেল, সি-এম-পি-ও'র প্রাক্তন ইনডাসট্রিয়াল টিমের লীডার ডঃ এ এন বসুই স্মারকলিপিটি তৈরি করেছেন। ভূমিকায় ও স্মারকলিপিতে রাজ্যের বেকার সমস্যার কারণ ও তার সমাধান সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে, অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে এমন লোকের পক্ষে ওইসব কথা বলা অসম্ভব। এই দুইজনের বক্তব্যকে অর্বাচীনের মতামত হিসাবে অগ্রাহ্য করা যেত। কিন্তু দুটি কারণে ওঁদের মতামত অবহেলা করা উচিত হবে না। প্রথমত, সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। শ্রীরায় এখন মুখ্যমন্ত্রী। কাজেই স্মারকলিপির বক্তব্যের দ্বারা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভা চালিত হলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ আরও তমসাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, ওই দুই ভদ্রলোক রাজ্য যোজনা পর্ষতে স্থান পেয়েছেন। শ্রীকল্যাণ বিশ্বাস সেক্রেটারি এবং ডঃ অজিত নারায়ণ বসু যোজনা পর্ষতের সদস্য।

ডঃ অজিত নারায়ণ বসু পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের সমস্যা বোঝাতে গিয়ে কেবল কারখানার শ্রমিকদের (পৃঃ ২) কথা উল্লেখ করেছেন। ভিন্ন রাজ্যের শ্রমিকেরা এ-রাজ্যের কল-কারখানায় বেশী কাজ পাওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের কাজ পাওয়ার সুযোগ কম, সে কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু কল-কারখানা

ছাড়া অন্যান্য শিল্প, যেমন পরিবহণ, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ কী হারে বেড়েছে বা কমেছে, স্মারকলিপিতে তার কোনও উল্লেখ নেই।

রাজ্যে কর্মসংস্থানব্যবস্থার সম্প্রসারণ না হওয়ায় স্মারকলিপিতে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক, ভিন্ন রাজ্যের শ্রমিক, শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীরা তাদের আয় ও মুনাফা এ-রাজ্যে খরচ না করে, ভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে নেয়। দুই, কেন্দ্রীয় সরকার কর হিসাবে যে টাকা সংগ্রহ করেন, তার সামান্যই পশ্চিমবঙ্গকে ফিরিয়ে দেন। তিন, অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য যোজনার বরাদ্দ কম। ১৯৭২-৭৩ সালে ভারতে জনপ্রতি যোজনার ব্যয় ছিল ৪০ টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতি ব্যয় ১৭ টাকা। চার, ভারত সরকারের মূল্যনীতি ও রেল-মাশুলের হার পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। স্মারকলিপিতে এই প্রসঙ্গে ইস্পাত, কয়লা ও তুলোর দাম এবং তুলো ও তৈলবীজের রেল-মাশুলের কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী "এ্যাগোনি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল" বইটির জন্য সাংবাদিক রণজিৎ রায়ের উপর রুষ্ট। কিন্তু মজার ব্যাপার, স্মারকলিপিতে শ্রীরণজিৎ রায়ের যুক্তিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যাই হোক, ডঃ অজিত নারায়ণ বসু অ বাঙালী শ্রমিকদের আয়ের একটা বড় অংশ ভিন্ন রাজ্যে চলে যাওয়ার কথা বললেও, পাট-চাষীদের পাটের দামের অংশ বিশেষ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ভিন্ন রাজ্যে চলে যাওয়ার ঘটনা তাঁর চোখে পড়েনি। সঞ্চয় ও নতুন মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে এ-রাজ্যের লোকদের বা রাজ্য সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই? এই প্রবন্ধের প্রথমেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি রাজ্য সরকারের কিছু কিছু উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে, ওই জাতীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি আকারের একটা উদ্যোগী শ্রেণীও ওই সব রাজ্যে গড়ে উঠেছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ওই জাতীয় উদ্যোগীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অন্যত্র রাজ্য সরকারগুলি কী কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তা স্মারকলিপি প্রণেতাদের জানা না থাকায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাও তাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিক নেতারা নিছক অজ্ঞতাবশে কেন্দ্রীয় করের অংশ বণ্টন সম্পর্কে যে-সব কথা বলে থাকেন, সি-এম-পি-ও'র মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা সংস্থার পক্ষে তা কী করে বলা সম্ভব? কলকাতা বন্দর

দিয়ে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি-রপ্তানি হয়। কিন্তু কলকাতা বন্দর থেকে যে শুল্ক আদায় হয়, তার পুরো অংশ পশ্চিমবঙ্গ কেন পাবে? কলকাতা বন্দর আছে বলেই এ-রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে, বন্দরের সম্প্রসারণ হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সেই আয়ের বেশীরভাগ এই রাজ্যে ব্যয় হবে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক কার্যত ক্রেতারাই বহন করে থাকেন এবং সে-ক্রেতারা কোনও একটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কীভাবে ওই করের টাকা বণ্টন হবে, সে-বিষয়ে বিভিন্ন ফিন্যান্স কমিশন নতুন ফরমূলা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। কলকাতা থেকে যে-আয়কর ও কর্পোরেট-ট্যাক্স আদায় হয়, সে আয়ের উৎস কিন্তু কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়। বিড়লা ব্রাদার্সের হেড অফিস কলকাতায় ছিল বলেই ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের ওরিয়েন্ট পেপার মিলসের হেড অফিসও কলকাতায় ছিল। বিহারের অজস্র কয়লা-খনি এবং আসাম ও ত্রিপুরার চা-বাগিচার হেড অফিসও কলকাতায়। তেমনি বিহারে জামসেদপুরের ইস্পাত কারখানার হেড অফিস বোম্বাই শহরে। আয়কর দেওয়ার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ওই বাবদে আদায়ীকৃত টাকার অংশ পায় বলে কলিকাতার অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী কিছুকাল ধরে রাজস্থানে হেড অফিস রেজিস্ট্রী করছে এবং তার ফলে বর্তমানে কলকাতা থেকে আদায়ীকৃত আয়করের শতকরা হারও কমে যাচ্ছে। বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে আদায় করা কর্পোরেট-ট্যাকস্ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন শুরু হলে দেখা যাবে কোনও মাড়োয়ারি প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস আর কলকাতায় নেই।

রাজ্যের কর্মসংস্থান প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের যে-নীতির ফলে ব্যাহত হচ্ছে, সেটি কেন্দ্রীয় করের অংশ বণ্টন নয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী না হওয়ায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। প্রতিটি যোজনাতেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরকারী মালিকানায় শিল্প স্থাপনের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় যোজনাকালে দুর্গাপুরে মিশ্র ইস্পাত কারখানা, কলকাতায় একটা অটোমেটিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও মডার্ণ বেকারী ছাড়া আর কোনও প্রকল্প এ-রাজ্যে চোখে পড়বে না। হলদিয়ায় তেল-শোধনাগার ও সার কারখানা কতদিন পরে চালু হবে, তা এখন বলা অসম্ভব। অপরদিকে, তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনায় উত্তরপ্রদেশ,

মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মহীশূর, অন্ধ্র, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি শিল্প-প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে, অনগ্রসর ওড়িশা ও আসামে কর্মসংস্থানের প্রধান সুযোগ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এই সঙ্গে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতে একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা সম্প্রসারণের যে সুযোগ পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে তা জোটেনি। ১৯৭১ সালের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের শিল্পমন্ত্রী শ্রীহাসানুজ্জামান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য দিল্লির লাইসেন্স কমিটীর নিকট পড়ে-থাকা আবেদন পত্রগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরবার করেছিলেন।

রেলে ইস্পাত চলাচলের ব্যাপারে যে-নীতি চালু আছে সেটি খুবই অসঙ্গত। মহারাষ্ট্রের কাপড়ের কলগুলিকে বোম্বাই শহরে যে-দামে তুলো কিনতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলিকে তার সঙ্গে বোম্বাই থেকে কলকাতা আনার জন্য রেল-মাশুল যোগ করতে হয়। এ-কথা অবশ্য আমদানী তুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মহারাষ্ট্রের কাপড়ের কলগুলি নিজেদের এলাকায় যে-সুবিধাজনক দামে তুলো কিনতে পারে, পূর্বাঞ্চলের কোনো কাপড়ের কল সেই সুযোগ পায় না। যে-যুক্তিতে সারা ভারতে ইস্পাতের দাম এক রাখা হয়েছে, সেই একই যুক্তিতে তুলোর দামও এক রাখা উচিত ছিল এবং অন্তত বিদেশী তুলোর ক্ষেত্রে প্রতি বন্দরেই এক-দামের নীতি চালু করা যেত।* তবে, কেবল রেল-মাশুলের তারতম্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান বাড়েনি,— এই জাতীয় মন্তব্য সত্যের অপলাপ মাত্র। (মিলে প্রস্তুত কাপড় মহারাষ্ট্র, গুজরাত বা মাদ্রাজ থেকে কলকাতা পাঠাতেও রেল-মাশুল লাগে)। ইঞ্জিনীয়ারিং ও বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকেরা মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশী মজুরি পায়। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-পরিচালনার মান মান্ধাতা আমলের। কল-কারখানার যন্ত্রপাতিও সেকেলে। কোনও শিল্পপতি তার কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাতে চাইলেও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের জন্য তা সম্ভব নয়। অবশ্য সেই সঙ্গে পরিচালনব্যবস্থার উন্নতির ব্যাপারেও শিল্প-মালিকেরা কোনো দৃষ্টি দেননি। সিনথেটিক কাপড় উৎপাদনের দিকেও

---

* বিদেশ থেকে আমদানি করা পেট্রোলিয়াম তেলের জন্যে দাম সব বন্দরেই এক—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার দামের মধ্যে কোনো ফারাক নেই।

প্রথমে তেমন নজর পড়েনি। অপর দিকে, রেলের চাহিদা মেটানোর কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলিও রেলের নিকট থেকে উপযুক্ত দাম পায় না। ফলে প্রতি বৎসরই এই সব ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলি ক্রমেই লোকসানের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে এবং সরকারের নিকট থেকে লোকসান পূরণের জন্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও কোন কোন রাজনৈতিক নেতা ওই সব কারখানার পরিচালনার ভার নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন। কারিগরী দক্ষতা বাড়াতে পারলে সব শিল্পেরই উৎপাদন-ব্যয় কমানো যায় এবং তখন রেল-মাশুলের পার্থক্য থাকলেও খুব বেশী অসুবিধা হয় না। মনে রাখা দরকার যে, জাপান ইস্পাত উৎপাদনের সব কাঁচা মাল বিদেশ থেকে আমদানি করেও সবচেয়ে কম দামে ইস্পাত উৎপাদন করে থাকে!

সি-এম-পি-ও'র স্মারকলিপিতে যোজনার ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। যোজনার ব্যয় সম্পর্কে বাইরের লোকের কয়েকটি ভুল ধারণা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক দপ্তরের, যেমন স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের কোনও উন্নয়ন কার্যসূচী যোজনার ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। আবার শিক্ষা-দপ্তরের সব ব্যয়ই উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ব্যয় বলে ধরা হয়। তাছাড়া, একটা পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় যে-কাজ আরম্ভ হয়, সেই যোজনা শেষ হওয়ার পর সেই প্রকল্পের জন্য ব্যয়িত অর্থ সাধারণ বা "নন-প্ল্যান" ব্যয় বলে ধরা হয়। সেজন্য বর্তমানে কংসাবতী প্রকল্পের ব্যয়কে যোজনার ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয় না। প্রতি চার বছর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ফিনান্স কমিশনের নিকট থেকে রাজ্যগুলি বেশী টাকা আদায়ের জন্য ওই সাধারণ ব্যয় বেশী করে দেখিয়ে থাকে। এজন্যই ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন-কর্মসূচীর জন্য জনপ্রতি বরাদ্দ ১৭ টাকার বেশীই ছিল। রাজ্য-যোজনার আয়তন কত বড় হবে, তা অনেকটা যোজনার জন্য রাজ্য সরকারের সংগৃহীত রাজস্বের উপর নির্ভর করে। ১৯৬৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের যোজনার প্রায় পুরো ব্যয় দিল্লি থেকে আসে। রাজ্যে জনপ্রিয় থাকার জন্য রাজ্য সরকার যোজনার জন্য টাকা তোলেনই নি। মহারাষ্ট্র-গুজরাতের মতো রাজ্যের সর্বত্র কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে নেই বলে পশ্চিমবঙ্গ জীবনবীমা সংস্থা বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট থেকেও বেশী টাকা পায়নি। উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচী এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার। কোনপ্রকল্পের জন্য টাকা পেয়েও নিখুঁত পরিকল্পনার অভাবে তা কার্যকর করা যায় না। সেজন্য প্রতি বৎসর দিল্লিতেই টাকা ফেরৎ যায়। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনকালেও এই ব্যাপার

ঘটেছে। রাজ্য সরকারগুলির শিল্প উন্নয়ন সংস্থা তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও রাজস্থানে সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে সাহায্য করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কয়েকটি বেসরকারী সংস্থাকে সাহায্য করা ছাড়া, দেনা শোধের জন্ত দুর্বল শিল্পসংস্থাকে ঋণ দিয়েছে। দুঃখের বিষয়, সি-এম-পি-ও রচিত স্মারকলিপিতে বর্ণিত বেকারসমস্যা বৃদ্ধির কারণগুলি দিল্লির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে ও অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে উৎসাহিত করে, কিন্তু রাজ্যের বেকারসমস্যার প্রকৃতি ও প্রকৃত কারণ বুঝতে সাহায্য করে না।

॥ ৩ ॥

সি-এম-পি-ও'র প্রাক্তন ডিরেক্টর শ্রীকল্যাণ বিশ্বাসের নামে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত "দি মেমোরাণ্ডাম অন পারসপেকটিভ প্ল্যান ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৭১-৮০)" পুস্তিকায় পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, আলোচ্য স্মারকলিপিতে ডঃ অজিত নারায়ণ বসু সেই একই যুক্তি ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থা চালু হলে নাকি অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান কৃষিতেই করা সম্ভব। (পৃঃ ৪৪)। কল্যাণ বিশ্বাস তাঁর ভূমিকায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যের কৃষিতে নাকি ৭৬ থেকে ৯৫ লক্ষ লোকের পূর্ণ সময়ের কর্মসংস্থান সম্ভব। বর্তমানে কৃষিতে আংশিক ও পুরো সময়ে ৭২ লক্ষ লোক নিযুক্ত। সকলকে পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসাবে গণ্য করলে ৫২ লক্ষ লোক কাজ করছে বলে ধরা যায়। তাহলেই কৃষিতে অতিরিক্ত ২৪ থেকে ৪৩ লক্ষ কর্মীর পূর্ণ সময়ের কাজ জোটানোর সুযোগ আছে! কীভাবে এটা সম্ভব হবে? প্রতি একর জমিতে বছরে দুই থেকে আড়াইটি ফসল উঠলে এটা সম্ভব হবে! কারণ কল্যাণ বিশ্বাসের মতে, প্রতি একরে ফসলের জন্য একজন মানুষের গড়ে ৭০ দিন কাজ মিলবে এবং ৩৬৫ দিনের মধ্যে কোন কৃষক ২৫০ দিন কাজ করলেই তাকে পুরো সময়ের কর্মী হিসাবে গণ্য করতে হবে। (পৃঃ III)*। ডঃ অজিত নারায়ণ বসু অন্যত্র হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, অতিরিক্ত ২০ লক্ষ একরে আর একটি ফসল উৎপন্ন হলে

* রাজ্য সরকারের সি-এ-ডি-পি প্রকল্পে কৃষি-শ্রমিকদের জন্য বছরে ২৫০ দিন কাজের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

নাকি আরও ৫৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব। (পৃঃ ৪৩) অবশ্য রাজ্যের চতুর্থ যোজনার লক্ষ্য অনুসারে প্রতি বছরে শতকরা ১৭·৮% নতুন জমিতে একাধিক ফসল হবে ধরে নিয়েই ডঃ বসু হিসাব করেছেন যে, একাধিক ফসলের জমি ১৯৬৭-৬৮ সালের ৩০ লক্ষ একর থেকে বেড়ে ১৯৭১-৭২ সালে ৫০ লক্ষ একরে পৌছাবে। (পৃঃ ৪৩)।

৩৬৫ দিনে বছর। ২৫০ দিন কাজের সুযোগ হলে কর্মহীন থাকতে হবে ১১৫ দিন। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিতে বদলি শ্রমিকেরা কোন বছরে ২৫০দিন কাজ করলে পরের বছর আইনত স্থায়ী শ্রমিকের মর্যাদা পেতে পারে। সরকারী অফিসে রবিবারে ও অন্যান্য ছুটির দিন বাদ দিলেও ২৫০ দিনের বেশী কাজ করতে হয়। মাস মাইনের চাকুরিতে ছুটির সংখ্যা বেশী হলেও কিছু আসে যায় না। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে লোকের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ছুটির সংখ্যাও বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ওভার টাইম বা পার্ট-টাইম কাজ। এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশের কোন তুলনাই চলে না। এদেশের কৃষকেরা অদূর ভবিষ্যতে ২৫০ দিন কাজ করে সারা বছর স্বচ্ছল জীবন যাপনের সুযোগ পাবে, এমন আশা কল্পনাবিলাস মাত্র। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী মন্ত্রী হয়ে বিশেষজ্ঞদের অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে নিজের দলের লোকদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সি-এম-পি-ওতে ডঃ বসুর নেতৃত্বে প্লানিং অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। আর সেই সুবাদেই অজিত বসু প্লানার। যে কৃষি-বিষয়ে তাঁর কোন ধারণা নেই, সেই কৃষিতেই কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ডঃ অজিত নারায়ণ বসু প্রতি বছর রাজ্যের শতকরা ১৭·৮ ভাগ কৃষি জমি এক ফসলের বদলে একাধিক ফসলের জমিতে রূপান্তরিত হবে বলে ধরে নিয়েছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষি জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্নের সুযোগ থাকলেই কি বছরে দুই বা আড়াইটা ফসল পাওয়া যায়? কোথাও কোথাও তিনটি ফসলও পাওয়া সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বন্যার কথা সি-এম-পি-ও'র পরিকল্পনা রচয়িতাদের কি একেবারেই মনে ছিল না? বন্যার প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হয়নি বলে সেচ-এলাকাতেও পর পর তিন বৎসর অনেক কৃষকের ফসল মার খেয়েছে এবং তাঁরা ধার-দেনা ও অপরের সাহায্যের উপর বেঁচে আছেন; অপরের জমিতে ক্ষেত-মজুরের কাজ করতেন, এমন অনেককে কলকাতার রাস্তায় স্থান নিতে হয়েছে। আর উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গতেরা ভিড়

করেছে শিলিগুড়ি শহরে। বন্যার ফলে বহু এলাকার সেচ পাম্পগুলি অকেজো হয়ে যাওয়ার ঘটনা কলকাতার বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও ছাপা হয়েছিল। অপরদিকে সেচ ব্যবস্থা যতই উন্নত হোক, খরার জন্য ফসলের ক্ষতি একেবারে বন্ধ করা অসম্ভব। কয়েক বৎসর আগে অস্ট্রেলিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনের ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে সেচব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে খরার প্রকোপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব।

সি-এম-পি-ও রচিত স্মারকলিপিতে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপরেই সবুজ বিপ্লব নির্ভর করে বলা হয়েছে। কারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ না হলে শস্তায় সেচের ব্যবস্থা করা যায় না, ডিজেল পাম্পের জন্য খরচও অনেক বেশী পড়ে। তবে গ্রামে বৈদ্যুতীকরণের সঙ্গে কৃষিতে আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন এবং ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন সবুজ-বিপ্লবের মৌল শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃঃ ২২-২৩)।

পারসপেকটিভ প্ল্যান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ পৌঁছানোর কথা ১৯৮৯ সালে। তার আগেই ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা আশিটি গ্রামে নাকি বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। সেজন্য মোট খরচ পড়বে ৩৬০ কোটি টাকা। (স্মারকলিপি। পৃঃ ২৩)। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে সেচ-পাম্পের সাহায্যে সেচেরও ব্যবস্থা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকলে তা গ্রামে পাঠাতে যে অসুবিধা হয় না, হরিয়ানা ও গুজরাত তা দেখিয়েছে। হরিয়ানা গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রাজ্যের চতুর্থ যোজনার গোটা বরাদ্দ প্রথম বছরে খরচ করে এবং ঘাটতি টাকা জীবন বীমা সংস্থার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে প্রথম বছরেই রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম ছুঁয়ে বিদ্যুতের তার নিয়ে গিয়েছে। গুজরাত সরকার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-গুলির কাছ থেকেও ঋণ পেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সাঁওতালদি তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অনুমোদন মিলেছিল ১৯৬৮ সালে। ১৯৭৩ সালে প্রথম পর্যায়ের কাজটি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা সম্প্রসারণের যে কর্ম-সূচী রচনা করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে কার্যকর করা হবে, তা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে খরা অধ্যুষিত জেলা দুটি অর্থাৎ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহের সঙ্গে সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণের যোগাযোগ কোথায়? জিওলজিক্যাল সার্ভের সমীক্ষা অনুসারে ওই দুটি জেলায় নলকূপ বসিয়ে তোলার মতো জল মাটির নিচে নেই। দুই জেলাতেই আগেকার

পদ্ধতি অনুসারে বড় দীঘি এবং সায়রে বৃষ্টির জল জমানোর প্রয়োজন। অবশ্য নদী-গর্ভে পাম্প বসিয়েও জল পাওয়া যেতে পারে। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের বহু জায়গায় গভীর নলকূপ বসিয়ে ভূগর্ভস্থ জল বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য ওইসব জায়গায় পুকুর কেটে বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখার কথা হচ্ছে। তাছাড়া, যেসব জায়গায় সেচ-খাল বা পাম্পের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করে দুই, আড়াই বা তিনটে ফসল উৎপন্নের ব্যবস্থা হয়েছে, তার অনেক জায়গাতেও বন্যার ফলে ফসল নষ্ট হচ্ছে, মরছে গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগী। ভেসে যাচ্ছে পুকুর বা নিয়ন্ত্রিত খালের মাছ। ফলে ফসলের সঙ্গে মৎস্য চাষ, পোলট্রি ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয়িত অর্থ কৃষকের দেনার পরিমাণ বাড়াচ্ছে। যেখানে ফসল বাঁচানোর ব্যবস্থা অনিশ্চিত, সেখানে কৃষকেরা কোন্ আশায়, কীভাবে বারবার অধিক ফলনশীল ফসলের চাষের জন্য খরচ করবে? বন্যার আশঙ্কা আছে, এমন এলাকায় ক্ষুদ্রশিল্পও গড়ে উঠতে পারে না।

স্মারকলিপিতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, গ্রামে বৈদ্যুতীকরণের পর সেচের ব্যবস্থা করলেই হবে না, কৃষকেরা জলের সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়ার উপরেই গ্রামে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা চালু হওয়া নির্ভর করছে। অবশ্য একই সঙ্গে ভূমি সংস্কার করে সরকারের হাতে আসা জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন এবং ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। তবে গ্রামগুলিকে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে উদ্বৃত্ত কৃষি-পণ্য বিক্রি ও কৃষির জন্য সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি কেনার ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

অধিক ফলনশীল বীজ বা একাধিক ফসলের চাষ চালু করতে হলে চাই প্রচুর মূলধন। কৃষি পরিবারের কিছু লোকেরও অন্য সূত্র থেকে আয়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার। জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া বা থাইল্যাণ্ডে কৃষি পরিবারের কিছু লোক অ-কৃষিকাজে নিযুক্ত থেকে পরিবারের আয়ের একটি উৎস হিসাবে কাজ করে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে সেনাবাহিনী, সি-আর-পি, বি-এস-এফ ও টেরিটোরিয়াল আর্মিতে প্রায় প্রতি পরিবারেরই লোক আছে। তারা মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠায়। সেনাবাহিনীর অফিসারেরা শহরে অবসর জীবন যাপন না করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় কৃষিতে আত্মনিয়োগ করেছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তরা এসে বর্তমান পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় মুসলমান উদ্বাস্তদের ফেলে যাওয়া ৬০ লক্ষ একর জমি পেয়েছিল, ভারত-সরকার ওই উদ্বাস্তদের জন্য ৯১ কোটি

টাকা খরচ করে ২২১,০০ বাড়ি ও দোকান ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ২৪৩,০০০ পরিবারের মধ্যে ১৩১, ১২৫টি উদ্বাস্তু পরিবার ভারত সরকারের নিকট থেকে পরিবার পিছু এক লক্ষ টাকার বেশী ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিল। (রণজিৎ রায়: রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশান—টু রেসেজ, টু পলিসিজ। ইয়ং ইণ্ডিয়ান, স্পেশাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নাম্বার। ১৯৭২। পৃঃ ৫০-৫১।) প্রতি পরিবারের বাইরে থেকে টাকা আসার সুযোগ থাকায় গ্রামের বাজারে বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটে গ্রামের শতকরা পনেরোজন কর্মক্ষম ব্যক্তি কাজ পেয়েছে। তাতে গ্রামেরও উন্নতি হয়েছে। পাঞ্জাবের শহরগুলিও ঘিঞ্জি হয় নি। এই সঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস উল্লেখ করা দরকার: পাঞ্জাব হরিয়ানায় দেড় হাজার জনবসতির গ্রাম মাত্রেই পাকা রাস্তার সাহায্যে সড়ক পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত। বাজার, ছোট খাট শহরও বেশী দূরে নয়। ফলে একদিকে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের কাঁচামাল অতি সহজেই পাওয়া যায় এবং অপর দিকে উদ্বৃত্ত ফসল দ্রুত বিক্রি করা সম্ভব। পাঞ্জাব হরিয়ানার মতো আর কোন রাজ্য প্রথম থেকেই কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্য-দাম দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়নি। আবার গ্রামাঞ্চলে অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাষবাসে আত্মনিয়োগ করায় গ্রামাঞ্চলের কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ সহজ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বছরের পর বছর কৃষিতে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়াতে হলে কৃষি পরিবারে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় মূলধনের সরবরাহ, ধান, সার ও কীটনাশক সরবরাহ এবং উদ্বৃত্ত ফসলের উন্নত বিক্রয় ব্যবস্থা ও ফসলের নতুন নতুন ব্যবহারে উদ্যোগী হতে হবে: এই রাজ্যে বন্যা কৃষি-উন্নতির প্রতিবন্ধক। তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যসূচীর সঙ্গে কৃষি উন্নতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। স্মারকলিপিতে গ্রামাঞ্চলে সড়ক ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত পঞ্চম যোজনায় গ্রামাঞ্চলের সড়ক নির্মাণের জন্য মোট বরাদ্দের যে সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বৎসর পাবে, তাতে রাজ্যের অবহেলিত ১৩৩টি থানায় একই সঙ্গে কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব। কিন্তু ধরা গেল, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া দূরতম গ্রাম পাকা রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হল। কিন্তু সেই গ্রামের উদ্বৃত্ত ফসল কি লরি করে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে? কৃষকদের প্রয়োজনীয় জিনিস কি কলকাতা থেকে লরি করে পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার গ্রামে যাবে? ডঃ অজিত নারায়ণ বসু রচিত

স্মারকলিপিতে সুন্দরবনের কৃষকদের অবস্থার উন্নতির বা ওই এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন প্রস্তাব বা সুপারিশ কি আছে? গোসাবা বা পাথরপ্রতিমার কৃষকেরা চিরকাল অবহেলিত থাকবে এবং বাঁচার আশায় অবশেষে কলকাতার ফুটপাথে, স্টেশনে ও রেল লাইনের ধারে দিন কাটাবে?

রাজ্যের বেশীরভাগ জমিতে একাধিক ফসল চাষ করে রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের কথা শোনানো হয়েছে। এই প্রস্তাবিত সমাধান কতটা বাস্তবভিত্তিক তা বিচার করা প্রয়োজন। একটির বদলে একাধিক ফসলের চাষ চালু হলে সারা বছরে কাজ করার জন্য কৃষিতে অনেক বেশী লোক পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ পাবে। এইসঙ্গে আরও কর্মসংস্থান হবে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের কেনাবেচার কাজে ও পরিবহণ শিল্পে।

সেচের সুযোগ, জলের সদ্ব্যবহার জানলে এবং ক্ষুদ্রশিল্পে লোকের কাজের ব্যবস্থা করতে পারলেই দেশে সবুজ বিপ্লব হয় না। জমির ফলন বাড়ার সঙ্গে ভূমি-সংস্কারের যে কোন সম্পর্ক নেই, তাইওয়ান, থাইল্যাণ্ড, পাঞ্জাব-হরিয়ানার সবুজ বিপ্লবই তার প্রমাণ। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা বা কানাডায় কৃষি শ্রমিকেরা জমির মালিক না হয়েই জমির ফলন বাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই অকম্যুনিষ্ট দেশের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনকে খাদ্যশস্যের জন্য কানাডা ও আমেরিকার দ্বারস্থ হতে হয়। জমিতে অধিক ফলনশীল বীজের একাধিক ফসল উৎপাদন করা একটি টেকোনলজিক্যাল সমস্যা। পাঞ্জাব-হরিয়ানা, তামিলনাড়ুর তাঞ্জোর এবং অন্যান্য এলাকায়, এমন কী পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান-বীরভূমে ভূমি সংস্কার ছাড়াই জমির ফলন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ভারতের কৃষি গবেষণা পরিষদের শ্রী এইচ কে জৈন স্বীকার করেছেন যে, "...the success of the new technology has clearly shown that technological reforms and capital investment in improved practices such as the use of fertilisers, improved seed, pesticides, farm machinery and storage facilities can become major instruments of our agricultural reconstruction programmes. (Indian Farming, August, 1972 P. 61).
ভূমি-সংস্কারের সমস্যা আসলে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ন্যায়-বিচার ও সামাজিক বিরোধের লক্ষণ দূর করার সমস্যা। বর্গাদার ও কম জমির মালিকেরা শিক্ষার সুযোগ পায়নি, গ্রামাঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। তাই তাদের জমির ক্ষুধাও বেশী। কিন্তু ভূমি-সমস্যার সমাধান ছাড়াই

পাঞ্জাব-হরিয়ানায় সবুজ বিপ্লব হওয়ায় "কৃষির আধুনিকীকরণের" (স্মারক-লিপির ভাষায়) সঙ্গে বর্গাদারদের উদ্বৃত্ত জমি দেওয়ার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা কি আর বলা যায় ?

আবার বর্গাদারেরা জমির মালিকানা না পেলে ফলন বাড়াতে উৎসাহ পায় না বলে যে কথা সচরাচর বলা হয়, তা যে কত মিথ্যা, ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়ের "এগ্রিকালচারাল একসটেনশান" বইটিতেও (পৃঃ ১৪১) তার প্রমাণ মিলবে। ডঃ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লক সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, অন্য জমি নেই এমন বর্গাদার এবং উপজাতি বর্গাদার বেশী পরিশ্রম ও ফসলের তদারকি করে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করে। সবচেয়ে গরিব বর্গাদার সবচেয়ে খারাপ জমি পায়, সে জমিতে সেচের সুবিধা নেই, সুতরাং অধিক ফলনশীল বীজও ওই জমিতে ব্যবহার করা যায় না। তা ছাড়া তার ওই বীজ ও সার কেনার পয়সাও থাকে না। সরকার জোতদারদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে যে জমি গরিব চাষীদের মধ্যে বণ্টন করেছেন, সে জমিতেও ফলনের পরিমাণ বর্গাদারের জমির ফলনের চেয়ে বেশী নয়। (ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৪২)।

অল্প জমির মালিকদের জন্য সরকারের বিশেষ কর্মসূচী থাকলেও, তারা কেন আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সুযোগ পায় না, ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়ের বইটিতে তার কিছু কারণ বলা হয়েছে। যেমন, অল্প জমির মালিকেরা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক থেকে কিছুই জানতে পারে না, ব্লক অফিসে তারা একেবারেই অবহেলিত। (পৃঃ ১১৯)। নতুন পদ্ধতিতে চাষবাস করলে এলাকায় মর্যাদা বাড়ে কিন্তু কম-জমির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নতুন পদ্ধতির ঝুঁকি নিতে দরিদ্র চাষী অক্ষম। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও কারিগরী জ্ঞানের অভাবও কৃষিতে আধুনিক জ্ঞান প্রয়োগের প্রতিবন্ধক হিসাব কাজ করে। তা ছাড়া, শহর থেকে গ্রামটি যতদূরে হবে, নতুন কৃষি পদ্ধতির প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন বীজ, সার, কীটনাশক পাওয়ার অনিশ্চয়তা তত বেশী বাড়বে কিংবা একেবারেই পাবে না। (পৃঃ ১২৩)।

॥ ৪ ॥

মজার ব্যাপার, শহর এলাকার শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানও আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে সম্ভব বলে স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে। কিন্তু শহর এলাকায় গৃহনির্মাণ ছাড়া আর কোনোভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগের

কথা স্মারকলিপিতে নেই। শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য শহরে উন্নয়নে কর্মসূচী নেওয়া দরকার। নতুন নতুন বাজার গড়ে তোলা, বাজারগুলিকে শহরে পরিণত করা এবং জেলা ও মহকুমা শহরগুলিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কাঁচামাল বিক্রির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে শহর এলাকায় জনসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ৯ লক্ষ। বাইরে থেকে লোক না এলেও স্বাভাবিক জন্মহারের জন্য শহরের জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু এক কলকাতা ছাড়া অন্যান্য শহরের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলেই ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের মধ্যে এই রাজ্যের কুড়ি হাজারের বেশী ও এক লক্ষ লোকের কম বসতির শহরের জনসংখ্যা প্রায় আট শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। হ্রাস পেয়েছে পাঁচ হাজারের কম লোকবসতির শহরের জনসংখ্যা। এই সব ছোটখাট শহরের উন্নতিও গ্রামের কৃষি-উন্নতির অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের শহরে জনসংখ্যা পশ্চিম মালয়েশিয়ার চেয়ে বেশী। শহরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগে কর্মসংস্থানের যে সুযোগ আছে, স্মারকলিপির রচয়িতাদের তা জানা নেই। তাই কলকাতার বাজারের জন্য লুধিয়ানা থেকে সোয়েটার, চাদর, নাইলনের জামা, মহারাষ্ট্র থেকে ওষুধ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে পেন্সিলও আসে। মাছ আসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে, কলা আসে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু থেকে। কলকাতাকে সারা ভারতের পণ্য বিক্রির বাজার হিসাবে রক্ষা করাই স্মারকলিপি-রচয়িতাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও পরিবহণ শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগের কথা মনে রেখে কোনো কর্মসূচী রচনা ও তা কার্যকর করার কথা স্মারকলিপিতে বলা হয়নি। ত্রিবেণী টিস্যু, দুর্গাপুরের এ-ভি-বি কারখানা এ-রাজ্যে সম্প্রসারণ করতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মহীশূর ও রায়বেরিলিতে নতুন কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন। এইসব শিল্পে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কোনো কথা স্মারকলিপিতে ছিল না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে লাইসেন্স না মেলার সংবাদ প্রকাশের পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লিতে প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে। পঞ্চম যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প প্রকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়বে কিন্তু সেকথা মনে রেখে রাজ্য পঞ্চম যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প-প্রকল্প স্থাপনের কর্মসূচী নেই। অজিত বসুরা কার স্বার্থ দেখছেন? পশ্চিমবঙ্গের, না অন্য কারও?

[সংস্কৃতি পরিক্রমা : শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৯ (১৯৭২)]

শহর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ৮

শহরের সংজ্ঞা সর্বত্র এক নয়—এক এক দেশে এক এক রকম। ভারতের আদমসুমারিতে (১৯৭১) পৌরসভা, ক্যান্টনমেণ্ট অথবা সরকারী ঘোষণা অনুসারে শহর এলাকা ছাড়া কমপক্ষে ৫ হাজার লোক বসবাস করে, কর্মরত ব্যক্তিদের শতকরা ৭৫ জন অ-কৃষিকাজে নিযুক্ত এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব কমপক্ষে প্রতি কিলোমিটারে ৪০০ (প্রতি বর্গমাইলে—এক হাজার), এমন এলাকাকে "শহর" হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে শহরের সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, শহর বলতে আমরা বুঝি এমন একটা জায়গা, যেখানকার সমাজ অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ, শ্রম-বিভাগ ও উদ্যোগ-প্রচেষ্টার দিক থেকে সমাজ অনেক বেশী বিভক্ত এবং সেই সঙ্গে সেখানে দক্ষতা-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই সব এলাকায় লোকে ঘর ও ফ্ল্যাটে বসবাস করে এবং তাদের জন্য চাকরি, পরিবহণ, বাজার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, খেলা-ধুলো ও আমোদ প্রমোদ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার।

কোনো বিশেষ শহর-এলাকা, নগর বা বড় শহরের অধিবাসীদের নিয়েই নাগরিক সমাজ গঠিত। আশা করা হয় যে, শহর উন্নয়নের যে-কোনো কর্মসূচী নিশ্চিতভাবে এই সমাজের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবে।

---

* ফোরাম ফর ম্যানপাওয়ার স্টাডিজ অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশানস-এর উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত "আরবান ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনশিয়াল" শীর্ষক সেমিনারে (২৮ এপ্রিল, ১৯৭৩) পঠিত মূল প্রবন্ধের পরিমার্জিত বাংলা সংস্করণ। ইংরেজী খসড়া প্রবন্ধটি বোম্বের ইংরেজী সাপ্তাহিক "জনতা"-য় (১৩ মে, ১৯৭৩) ছাপা হয়েছিল। সেমিনারে খসড়া পেপারটির উপর গঠনমূলক সমালোচনার জন্য লেখক ডঃ ভবতোষ দত্ত, অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, ডঃ নির্মল বসু রায়চৌধুরী, স্থপতি প্রিয় গুহ এবং ডঃ শেখ আবদুল করিমের নিকট ঋণী।

দুঃখের বিষয়, এদেশে একমাত্র নতুন দিল্লি ছাড়া সর্বত্রই "শহর-উন্নয়ন" শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। শহর উন্নয়ন বলতে সাধারণত রাস্তাঘাট, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, জল-নিকাশী ও পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা, বাসগৃহ-নির্মাণ জাতীয় সাধারণ নাগরিক সুবিধাদানের ব্যবস্থা বোঝায়। শহর উন্নয়নের এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার জন্য শহর-উন্নয়নের যে-কোনো প্রকল্পে কর্মসংস্থানের বিষয়টি ছোট করে দেখা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম-দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত বেকার-কমিশনের (ভগবতী কমিশন নামেও পরিচিত) নিকট ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সি-এম-পি-ও'র পক্ষ থেকে "পশ্চিমবঙ্গে বেকার ও কর্মসংস্থান" ("Unemployment and Employment In West Bengal") নামে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সি-এম-পি-ও'র তদানীন্তন কর্মী এবং বর্তমানে রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য ডঃ এ. এন. বসু ওই স্মারকলিপির রচয়িতা। রাজ্যের বেকারদের জন্য সম্ভাব্য যে-সব প্রকল্পে কাজের ব্যবস্থা করা যায়, স্মারকলিপিতে তার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। (পৃঃ ১৫)। কিন্তু সেই তালিকায় শহর উন্নয়ন স্থান পায়নি। স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, বাড়ি তৈরির সময় নিযুক্ত কর্মীর কাজ ছাড়া গৃহনির্মাণের মাধ্যমে অতিরিক্ত কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে না। কারণ বাড়ি তৈরির জিনিস ভিন্ন রাজ্য থেকে আসে। ফলে গৃহনির্মাণের মাল-মসলার চাহিদা বাড়লে এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। স্মারকলিপিতে শহরের সবচেয়ে কম-আয়ের কুড়ি শতাংশ অধিবাসীর জন্য গৃহনির্মাণের প্রস্তাব করা হয় এবং ওই প্রস্তাব কার্যকর হলে গৃহনির্মাণের সময়ে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। দিল্লির যোজনা কমিশনের "অ্যাপ্রোচ টু ফিফথ প্ল্যান"-এ সাধারন মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মিটানোর কর্মসূচী প্রসঙ্গেই গৃহনির্মাণের উল্লেখ আছে। কিন্তু গৃহনির্মাণ যে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে, একথা যোজনা কমিশনের সদস্যদের মাথায় আসেনি। যোজনা কমিশন অবশ্য গৃহনির্মাণ বলতে বোঝেন কেবল বসবাসের ঘর তৈরি করা।

নির্মাণ কাজ

এটা ঠিক যে, যে কোন শহর-উন্নয়নের কর্মসূচীতে কনস্ট্রাকশনের কাজ লোকের কর্মসংস্থান বাড়িয়ে থাকে। শহর উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মসূচী রচনার সময়ে প্রত্যক্ষভাবে ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, ওভারসিয়ার এবং অফিসের কাজের লোকদের এবং কাজকর্মের সময়ে প্রত্যক্ষভাবে অতিরিক্ত কিছু দক্ষ এবং অ-দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ইট ও পাইপ তৈরি, বালি তোলা এবং কয়লা, সিমেন্ট, ইট, বালি প্রভৃতি পরিবহণের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ প্রথম পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। আমাদের দেশে শহর উন্নয়ন কর্মসূচীতে এই মেটিরিয়াল প্ল্যানিং একেবারেই অবহেলিত। প্রথম পর্যায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সমস্যাটি অবহেলিত হওয়ায় কনস্ট্রাকশানের কাজকর্মের কাছাকাছি রাস্তা, ফাঁকা জায়গা বা ফুটপাথের উপর অজস্র দোকান, রেস্টুরেন্ট ও হোটেল গজিয়ে ওঠে।

কোনো সুপরিকল্পিত শহর-উন্নয়ন বলতে বাসগৃহ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকের অফিস, ডাক ও তারের অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, থানা, দমকলের আস্তানা, দোকান, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ডাক্তারদের চেম্বার, বিভিন্ন ধরনের ওষুধের (হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক) দোকান, লণ্ড্রী, সেলুন, কাপড় ছাপানোর দোকান, শাক-সবজি ও মাছ-মাংস, দুধ, ছানা জাতীয় খাদ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির বাজার, কাঠ ও আসবাবপত্র সমেত বাসগৃহনির্মাণের কাঁচামাল বিক্রির বাজার, নানা ধরণের ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের কাঁচামাল কেনা-বেচার বাজার, গুদামঘর, হিমঘর, হাঁস-মুরগি এবং গরু মোষ ও শূকরের খাবার কেনাবেচার বাজার, ফলের দোকান, পত্রিকার স্টল ও বইয়ের দোকান, ছাপাখানা ও ছাপাখানার প্রয়োজনীয় কাগজ বিক্রি ও ব্লক তৈরির দোকান, ফটো তোলার দোকান, রুটি-বিস্কুট লজেন্স এবং শীতল পানীয় তৈরির কারখানা, টেলারিং-এর দোকান এবং রেডিমেড কাপড় তৈরি ও বিক্রির ব্যবস্থা প্রভৃতি বোঝায়। সত্যিকারের শহর উন্নয়ন কর্মসূচী বলতে শহরে আরও সিনেমা, থিয়েটার-যাত্রা এবং সভা-সমিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হল, লাইব্রেরি ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা, খেলাধুলো ও আমোদ প্রমোদের জন্য ফাঁকা জায়গা ও পার্ক, গাড়ি-লরি ও বাস রাখবার

জায়গা বাড়ানোর ব্যবস্থাও বুঝিয়ে থাকে। শহর উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বেশী কর্মসংস্থান হয় পরিবহণ শিল্পে। কারণ আরও উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে আরও ট্রাক, বাস, ট্যাকসি, টেম্পো, রিকশা ও ভ্যানের সংখ্যাবৃদ্ধি। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গে অটো-রিকশা কার্যত অনুপস্থিত। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ছাড়া পরিবহণ শিল্প পরোক্ষভাবে গাড়ি ধোয়া ও মেরামত, গাড়ির যন্ত্রাংশ বিক্রি, সাইকেল, ভ্যান ও রিকশা মেরামতের দোকানের মাধ্যমে আরও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে থাকে।

উপরে যে সব প্রকল্পের নাম করা হল, তার বেশীরভাগ প্রকল্পে, এমনকি দাঁত ও চোখের ডাক্তারদের রোগী দেখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য, ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে ব্যাংকের ঋণ পেতে হলে কিছু অন্য শর্তও পূরণ করতে হয়। অবশ্য এই সব কর্মসংস্থানের সুযোগ কাজে লাগানো শহর ও তার পশ্চাৎভূমির অধিবাসীদের আয়, বিনিয়োগ, খেলাধুলো ও আমোদ-প্রমোদের সুযোগ, অন্য জায়গা থেকে ঝুঁকি নিতে পারেন এমন উদ্যোগী ব্যক্তির ওই শহরে আগমন, বিভিন্ন কাজে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা এবং বাসগৃহ সমেত গৃহনির্মাণে বিনিয়োগের পরিমাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কলকাতায় একদা জমিদার ও ব্যবসায়ীরা অনেক বাড়ি করেছিলেন বলে এই মহানগরীতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের যে সুযোগ পেয়েছিল, ওই জাতীয় বাড়ির অভাবে অন্যত্র শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সেভাবে বাড়তে পারেনি।

এদেশে শহরের সমস্যার প্রকৃতি

শহরীকরণের ভিন্ন ধরণের বিন্যাসের জন্য ভারতে শহর-এলাকার সমস্যার সঙ্গে মারকিন দেশ ও য়ুরোপীয় দেশগুলির শহুরে সমস্যার কোনো মিল নেই। ভারতে শহুরে জনসংখ্যার হার দেখে এই সমস্যার প্রকৃতি বোঝা যাবে না। ১৯'১ সালে ভারতে শহুরে জনসংখ্যা ছিল যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ, সেখানে ইংলণ্ডের মোট জনসংখ্যার ৭৮.৮৭ শতাংশ, ফ্রান্সের ৬৯.৯৭ শতাংশ, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬৯.৮৭ শতাংশ, সোভিয়েত রাশিয়ার ৫৫.৮৫ শতাংশ লোক শহরে বসবাস করত। তবে, ভারতের শহুরে জনসংখ্যার হার কম হলেও ভারতের মোট শহুরে জনসংখ্যা (১৯৭১ সালের আদমশুমারিতে

১০ কোটি ৮৮ লক্ষ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কিংবা জাপান ও শ্রীলঙ্কার মিলিত জনসমষ্টিরও অধিক। পশ্চিমবঙ্গের শহুরে জনসংখ্যাও (১৯৭১ সালে ১ কোটি ৮০ লক্ষ) পশ্চিম মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশী।

বোম্বের ইকনমিক উইকলির ৺শচীন চৌধুরী ১৯৬০ সালে বার্কলে (কালিফোর্নিয়া) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে পঠিত "সেন্ট্রালিজেশান অ্যাণ্ড ডিসেন্ট্রালিজেশান" নামক প্রবন্ধে এই তথ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের শহর এলাকায় বেকার ও প্রচ্ছন্ন-বেকারের হার অসম্ভব রকম বেশী। এশিয়ার বড় শহরগুলি সম্পর্কে অধ্যাপক বারটিল হোজলিংস অন্যত্র একই কথা বলেছেন। শহর-উন্নয়নের প্রতিটি কর্মসূচীতে শহুরে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী করে থাকা দরকার। এই শহুরে বেকারদের গ্রামাঞ্চলের কৃষিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার চিন্তা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। সম্প্রতি ডঃ লা মিণ্ট (Dr. Hla Myint), এডগার ওনেস-রবার্ট শ এবং অধ্যাপক অম্লান দত্ত কৃষি উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে শহর উন্নয়ন এবং নতুন শহর-এলাকা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। কৃষির উন্নতির জন্য দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বাজার ও নতুন শহর গড়ে তোলা দরকার। গ্রামবাসীরা যাতে আমোদ-প্রমোদ, ও পরিবহণে আরও বেশী পয়সা খরচ করতে পারে, তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে গ্রামে বাস করে আরও অনেক লোক শহরে জিনিসপত্র কেনাবেচা ও বণ্টনের কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। শহর উন্নয়নের বর্তমান ধারা অনুসারে শহরের চারপাশের গ্রামগুলিতে সব সময়ে কৃষির উন্নতি হয় না এবং ওই সব গ্রামের লোক গ্রামে বাস করে অ-কৃষি ও শহরের কাজকর্মে চাকরি পায় না, তাদের ছেলেমেয়েরাও শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার সুযোগ তেমন পায় না। কারণ শহর এলাকায় পৌরসভাগুলি নিজস্ব এলাকার মধ্যে রাস্তাঘাট তৈরি করেন, শহরের সঙ্গে চারপাশের গ্রামগুলিকে সংযুক্তিকরণের জন্য কোন সড়ক নির্মাণের কর্মসূচী রচনা করেন না, পৌরসভা ও রাজ্য সরকারের পূর্ত-বিভাগ কর্তৃক মিলিতভাবে এই জাতীয় কর্মসূচী রচনারও কোনো ব্যবস্থা নেই। সি এম-ডি-এ বৃহত্তর কলকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কাজে লিপ্ত থাকলেও পরিকল্পিত ইস্টার্ণ বাই পাসের সঙ্গে পূর্বদিকের গ্রামগুলিকে যুক্ত করার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। লণ্ডন শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য ১৮৯৮ সালে ইবেনজার হাওয়ার্ড ছোট ছোট "গারডেন সিটি" স্থাপনের প্রস্তাব

করেছিলেন। ইবেনজার হাওয়ার্ডের চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে প্যাট্রিক গেডেস হাওয়ার্ড-প্রস্তাবিত শহরগুলিকে আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। এই শতাব্দীর বিশ দশকে মারকিন দেশের শহরগুলিকে আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গণ্য করে কাজ আরম্ভ করা হয়। অধ্যাপক গেডেসের লেখায় ইংলণ্ডে কোনো কাজ না হলেও মারকিন দেশের শহর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাঁর প্রভাব অসামান্য।

অবশ্য এ-ব্যাপারে লুই মামফোর্ড, ফ্লোরেন্স স্টেন, ক্যাথারিন বুয়ার, হেনরি রাইটের লেখনী কম দায়ী নয়। দুঃখের বিষয়, ভারতে এখনও শহর উন্নয়নের কর্মসূচী শহরেরই নিজস্ব ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়, শহরকে আঞ্চলিক উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত করার কোনো চেষ্টা নেই।

শহর-এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি এবং রিজার্ভ ব্যাংক স্বীকার করলেও এটা কী করে আমাদের প্ল্যানার ও অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল? একটা কারণ, ইংরেজ, আমেরিকান এবং ডাচ অর্থনীতিবিদেরা এই সমস্যা নিয়ে তেমন লেখেননি। একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ তাঁর "আরবান ইকনমিকস" বইটিতে শহরের সমস্যা আলোচনা করেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতাই প্রমাণ পেয়েছে। শ্রীমতী আরশুলা হিকস পৃথিবীর বড় শহরগুলির সমস্যা নিয়ে বই লেখার কাজে সবে হাত দিয়েছেন। ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানাররা শহরীকরণের সমস্যা অবহেলা করেছেন বলে ডাচ অর্থনীতিবিদ জ্যান টিনবারজেন কিছুকাল আগে অভিমত প্রকাশ করলেও, সেই মন্তব্যের প্রতি টিনবারজেনের ছাত্রদেরও দৃষ্টি পড়েছে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, মারকিন দেশে প্রেসিডেন্ট জেফারসন ১৭৮৭ সালে নর্থওয়েস্ট অর্ডিন্যান্স জারি করে প্রতি ১০ মাইল ব্যাসার্ধের হিসাবে একটা বাজার স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বিশ দশকে আমেরিকার শহরগুলিকে আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে শহর এলাকার প্রাধান্য এবং গ্রামাঞ্চলও শহরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় য়ুরোপ আমেরিকার অর্থনীতিবিদদের শহর-উন্নয়ন সম্পর্কে তেমন ভাবতে হয়নি, তারা শহরের অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন। তৃতীয়ত, শহরের ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে এই অর্থনীতিবিদদের আদৌ কোনো ধারনা নেই। একটা তীর্থকেন্দ্রে তীর্থযাত্রী-সমাগমের জন্য কী ভাবে ধীরে ধীরে সেটি বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়, তা জানতে আগ্রহী হলেই এই অর্থনীতিবিদরা শহর এলাকায়

কর্মসংস্থানের সুযোগ অনুসন্ধানে ব্রতী হচ্ছেন। চতুর্থত, কোনো শিল্প-কেন্দ্র বা উপনগরীতে ক্রয়-ক্ষমতার মালটিপ্লায়ার এফেক্ট কী-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা তা আজও ধরতে পারেননি।

বাঁচিয়ে রাখার কর্মসূচী

১৯৬৯-৭০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্থ যোজনাকালে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য ১৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। এখনও পর্যন্ত যে-কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে বৃহত্তর কলকাতার নাগরিকদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কর্মসূচীতে হাসপাতালে অতিরিক্ত বেডের ব্যবস্থা, নতুন বাসগৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি কথা আছে, কিন্তু শহরের কোন্ এলাকায় এই সব কর্মসূচী কার্যকর করা হবে, সে-বিষয়ে কোনও সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। বস্তি উন্নয়ন, বস্তি অপসারণ এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিচ্ছেন, তার পুরোটাই ভরতুকি, এই টাকার একটা অংশও পরিশোধের প্রয়োজন হবে না। কোনো কর্মসূচী ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার বৃহত্তর কলকাতার বস্তি প্রকল্পে টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকার পরিমাণ ছিল ১৯৭০-৭১ সালে ৩ কোটি, ১৯৭১-৭২ সালে ৫ কোটি এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ৩৫ কোটি টাকা। সম্ভবত এই টাকাটা রাজনৈতিক কারণেই দেওয়া হয়েছে। বস্তি-উন্নয়নের নামে সি-এম-ডি-এ টাকাটার অপচয় করছে। বস্তি বজায় রেখে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী রচনার নামে কনসালট্যান্ট ফার্মগুলি ও ঠিকাদারেরা উন্নয়নের জন্য দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় ভাগ বসাচ্ছে, অথচ সি-এম-পি-ও'র পরিকল্পনাবিদরা বসেই আছেন, তাঁদের দিয়ে কর্মসূচী রচনা করানো হচ্ছে না। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার জন্য সি-এম-ডি-এ'কে সি-এম-পি-ও'র মুখ্য স্থপতিকে দিয়ে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করাতে হয়েছিল এবং সেই "টেকনিক্যাল ইভালুয়েশান রিপোর্ট" বিশ্ব ব্যাংকে পেশ করে ওই কর্মসূচীর ত্রুটি সংশোধন করা হবে বলার পরেই কলকাতার জন্য বিশ্বব্যাংকের ঋণ মিলেছে। ওই রিপোর্টই প্রমাণ করে, সি-এম-ডি-এ কনসালট্যান্ট ফার্মগুলিকে দিয়ে যে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী রচনা করেছেন, সেই কর্মসূচী কতটা ত্রুটিপূর্ণ! শহর-পরিকল্পনা সংস্থার পরিকল্পনাবিদদের কর্মসূচী রচনার কাজ

না দিয়ে কনসালট্যান্ট সংস্থাকে দিয়ে কর্মসূচী রচনা করানোর ব্যাপারে মারকিন দেশে অনেক বড় বড় শহরে কনসালট্যান্টদের একটা র‍্যাকেট আছে। এখানে ইতিমধ্যেই সেই র‍্যাকেট শুরু হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার সিঙ্গাপুরের অনুকরণে বস্তি তুলে দিয়ে সেখানে বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি করছেন। নীচের তলাগুলি অফিস ও অন্যান্য ব্যাপারে বেশী টাকায় ভাড়া দিয়ে উপরের তলাগুলিতে ওখানকার প্রাক্তন বস্তিবাসীদের কম-ভাড়ায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় প্রকল্প এলাকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে দেয় এবং বস্তির বদলে সেই জায়গায় বড় বাড়ি হওয়ায় সম্পত্তি-কর বাবদ পৌরসভার আয়ও বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম যোজনাকালে কার্যকর করার জন্য সি-এম-পি-ও ১৯৭২ সালে "আরবান রিনিউয়াল" এবং ওয়ার্ড-ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী রচনার প্রস্তাব করে। রাজ্য সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও এবং সি-এম-ডি-এ থেকে বিশ্বব্যাংককে পঞ্চম যোজনাকালে এই কর্মসূচী কার্যকর করার কথা বলা হলেও ওই কর্মসূচী রচনার ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি। পঞ্চম যোজনাকালে পাঁচ লাখ ও তার বেশী জনসংখ্যার শহরগুলি থেকে বস্তি অপসারণের জন্য যোজনা কমিশন রাজ্য সরকারগুলিকে কর্মসূচী রচনা করতে বলেছিলেন। রাজ্য যোজনা পর্ষদ এ কাজে এখনও হাত দেননি। উন্নয়নের নামে টাকা খরচ করা হলেও আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে বৃহত্তর কলকাতাকে নতুন করে গড়ে তোলার সমস্যা আজও অবহেলিত। অথচ কলকাতা পৌর-এলাকার ১ লক্ষ ২০ হাজার বসতবাড়ির শতকরা ৬ ভাগ বস্তি এলাকা এবং আরও শতকরা ৬ ভাগ বাড়ির অবস্থা খুবই শোচনীয়। কলকাতা পৌর-এলাকায় বাজারের সংখ্যা মাত্র ১৩৮। মহানগরী এবং বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেক বাজার তৈরি করলে রাস্তার হকারদের বাজারের দোকানে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে এবং তাতে অনেক নতুন লোক কাজ পাবে, পৌরসভারও আয় বাড়বে। কলকাতা পৌর-এলাকা সম্পর্কে যা বলা হল, অন্যান্য ছোটবড় শহরেও এই জাতীয় কর্মসূচী কার্যকর করা সম্ভব।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শহরতলি বলতে বোঝায় এমন শহর-এলাকা, যেখানে অনেক খোলা জায়গা, খেলার মাঠ, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বড় শহরের কেন্দ্র এলাকা থেকে বেশী। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতায় শহরতলি বলতে তার উল্টো জিনিসই বোঝায়, শহরতলিতে পৌর সুখ-সুবিধা কিছুই

নেই, এগুলি অনেকটা কোম্পানি টাউন বা "বেড-রুম" টাউনের মতো। ওই সব এলাকার অধিবাসীরা সকালে বাড়ি থেকে বের হয় কলকাতায় কাজ করার জন্য এবং দিনের শেষে সেখানে ফিরে যায়, কেবল রাতটুকু কাটানোর জন্য। খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থাও ওইসব ছোট শহরে নেই। দুর্গাপুর, কল্যাণী, অশোকনগর প্রভৃতি নতুন শহর এবং প্রস্তাবিত হলদিয়া ও লবন হ্রদ উপনগরী সম্পর্কেও একথা সত্যি।

প্রস্তাবিত পাতাল রেলের কাজ সম্পূর্ণ হলে মহানগরী এবং তার চার পাশের এলাকায় জমির ব্যবহার ও কাজকর্মের ধারা একেবারেই বদলে যাবে। পাতাল রেলের এক একটা স্টেশনে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার যাত্রী ওঠানামা করবেন। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে তাঁরা গন্তব্যস্থানে যাবেনই বা কী ভাবে? অত লোক এক জায়গা দিয়ে যাতায়াত করবে বলে প্রতিটি স্টেশনকে কেন্দ্র করে অজস্র দোকানদার ও হকার সওদা নিয়ে বসবে। স্টেশনের পাশে বাড়িগুলি ভেঙে ফাঁকা জায়গা, চওড়া রাস্তা ও নতুন বাজার তৈরি না করলে প্রতিটি স্টেশনের অবস্থা শিয়ালদহ স্টেশনের মতো হবে। স্টেশনের বাইরে এই ফাঁকা জায়গা, গাড়ির জন্য পার্কিং স্পেস, নতুন নতুন চওড়া রাস্তা এবং বাজার তৈরির টাকাই বা কে জোগাবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ-বাবদে খরচ করতে হলে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় উন্নয়ন বন্ধ না রাখতে হয়! সুপরিকল্পিত এবং ব্যাপক আকারে এখনই নতুন বসতবাড়ি, নতুন ব্যবসাকেন্দ্র, খেলাধুলো ও আমোদ-প্রমোদের আরও ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি নির্মাণের কাজ আরম্ভ না করলে কলকাতার সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। জেলা, মহকুমা এবং বাজার-শহরের উন্নয়নের প্রশ্ন একেবারেই অবহেলিত, অকটোরয় এলাকার বাইরে নতুন ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ থাকলেও সে কথা মনে রেখে বর্ধমান, আসানসোল বা খড়্গপুরেও শহর উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে না। এইসব শহর এলাকার উন্নয়ন না হলে কলকাতায় নতুন আসা জনস্রোতের হার কমানো যাবে না।

এখানে প্রস্তাবিত শহর-উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসারে কর্মসূচী রচনা ও তা কার্যকর করার পথে বাধা অনেক। যোজনা কমিশনে বা রাজ্য যোজনা পর্ষদে কোনও স্থপতি কিংবা টাউন প্ল্যানার নেই। এমনকী, কেন্দ্রীয় সরকারের শহর উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ দপ্তরের বিজ্ঞান ও কারিগরী উন্নয়ন কমিটীর যিনি ভারপ্রাপ্ত, তিনি পেট্রো-কেমিকেলে পি.এইচ. ডি পাওয়া এক যুবক।

বাঙালীদের উদ্যোগী হওয়ার অবিসুধা ৯

বেশ কয়েক বছর যাবৎ এ-রাজ্যে বাঙালী, বিশেষ করে বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও শিক্ষিত বেকারদের, কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সরকার থেকে লাইসেন্স, কাঁচামাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি, মারজিন-মানি, অন্যান্য আর্থিক সাহায্য ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। নতুন ইঞ্জিনীয়ারদের 'উদ্যোগী শ্রেণী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এস-আই-এস-আই বিশেষ 'কোরস' চালু করেছেন, বর্তমানে বেকার যুবকদের বাস ও মিনি-বাসের পারমিট দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই সচেতন প্রচেষ্টার পিছনে কাজ করছে কেরানীর চাকরি করার মানসিকতার বদলে বাঙালীদের মধ্যে অন্য পেশা গ্রহণ ও স্বাবলম্বী হয়ে নিজে-কিছু-করার মানসিকতা গড়ে তোলা। কারণ নিজেরা কল-কারখানা স্থাপনে ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করতে উদ্যোগী হলে নিজেদের কাজের ব্যবস্থা তো হবেই, সেখানে অন্য বাঙালীরও কাজ জুটবে। তখন এক দিকে বাঙালীদের মধ্যে সচ্ছল লোকের সংখ্যা বাড়বে এবং অপর দিকে রোজগারের টাকার একটা বড় অংশ আর ভিন্ন রাজ্যে চলে যাবে না। আর এই রাজ্যে ওই টাকা খরচের মাধ্যমে আরও অনেক লোকের কাজ জুটবে।

পশ্চিমবঙ্গে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেই বাঙালী যুবকদের স্ব-নিযুক্ত কমে আকৃষ্ট করার চেষ্টা হয়। তিনি কলকাতার জন্য বেবি ট্যাকসির লাইসেন্স বাঙালী যুবকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সেই সব ট্যাকসি বাঙালীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যান্য রাজ্যেও রাজ্য সরকারগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর লাইসেন্স দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী মুখপাত্ররাই একাধিকবার স্বীকার করেছেন যে, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কারখানার অস্তিত্ব কাগজে-কলমে। কাঁচামাল নিয়ে কারখানায় পণ্যোৎপাদন করা তাদের কাজ নয়, নিয়ন্ত্রিত দামে কাঁচামাল কিনে খোলা বাজারে বেশী দামে বিক্রি করাই তাদের ব্যবসা। অনেকে অবশ্য সত্যিকারের

আশা নিয়ে শিল্প-স্থাপনে বা ব্যবসা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারেননি। সরকারী সাহায্য ও ব্যাংকের ঋণ পেলেই যে-কোনও ব্যক্তি নতুন শিল্পে বা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। আর একই সাহায্য পেলে একজন রাজস্থানী বা গুজরাতী যে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন, একজন বাঙালীর পক্ষে সেই সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব। ব্যর্থতার জন্ত ওই বিশেষ বাঙালীকে দায়ী করা যেতে পারে বটে, কিন্তু তাতে শিল্পে বা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জনের চাবি কাঠির সন্ধান মিলবে না।

প্রথমে মনে রাখা দরকার, যে-মানসিকতা কেরানীর চাকরি, শিক্ষকতা বা নিজে ঝুঁকি না নিয়ে কাজ করার সহায়ক, সেই মানসিকতা শিল্প-বাণিজ্য চালানো বা তাতে সাফল্য অর্জনের সহায়ক নয়। বাঁধা-ধরা জীবনযাত্রা যে মানসিকতার জন্ম দেয়, সেই মানসিকতা নতুন নতুন কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে না, ওই মানসিকতা কোনও ঝুঁকি নিতেও শেখায় না, ভবিষ্যতে সামাজিক মর্যাদা অর্জনের কথা ভেবে বর্তমানে কষ্ট স্বীকারেও উদ্বুদ্ধ করে না। শিল্প ও ব্যবসায়ে সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত হল, যে-কোনও কাজকে কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, সামাজিক অমর্যাদার কথা ভেবে কাজ করা থেকে বিরত হলে প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি। ইংরেজ আমলে ভারতীযদের মধ্যে শিল্প স্থাপনে সবচেয়ে অগ্রণী হয়ে সাফল্য অর্জন করেন সম্প্রদায় হিসাবে পার্সীরা। পশ্চিম ভারতে অনেক দেরিতে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, বোম্বাই শহরে পার্সীদের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া পার্সীরা প্রয়োজন হলে যে কোন কাজ করতে কখনও পিছিয়ে যেত না। এই শেষোক্ত চারিত্রিক গুণটি বাঙালী ও ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নেই। ফলে কোন কোন বাঙালী যুবক যখন ট্যাকসি চালান, তখনও তিনি একবার শুনিয়ে দেন যে ট্যাকসি চালালেও তিনি ভদ্রলোকের ছেলে। মিনিবাস চালানোর মাধ্যমে বেকার যুবকদের কাজের ব্যবস্থার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭২ সাল থেকে বেকার-যুবকদের মিনি-বাসের লাইসেন্স ও মারজিন-মানি দিলেও দু একজন ছাড়া তাদের কাউকে মিনিবাসে দেখা যায় না। আবার সরকারী বাসে কনডাক্টরের চাকরি করলেও অনেকে টিকিটের পয়সা চাইতে লজ্জা বোধ করেন। এই জাতীয় মানসিকতার কারণ প্রধানত তিনটি। এক, কলম পেশার কাজ বাঙালী সমাজে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। দুই, বাঙালীদের মধ্যে

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযুক্ত মানসিকতার অভাব। ওই মানসিকতার অভাব না হলে যখন যে-কাজ করতে হবে, সেই কাজ ভালো ভাবে করায় মধ্যে একটা আনন্দ পাওয়া যেত। এই মানসিকতা আবার উত্তরাধিকার সূত্রেও পাওয়া যায়। বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে বাড়ির লোককে যে-ভাবে কাজকর্ম করতে এবং যে-সব কথাবার্তা বলতে শোনে, সে-সব কাজকর্ম ও কথাবার্তা বাড়ির কিশোর ও যুবকদের মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই ধরনের মানসিকতা আবার নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবও সৃষ্টি করে থাকে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্যোগী শ্রেণী দেখা যায়, বাংলা, বিহার বা ওড়িশায় সেই ধরণের কোন উদ্যোগী শ্রেণী দেখা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই শ্রেণীর উদ্যোগী ব্যক্তির জন্ম হয়নি। ডঃ অমিয় বাগচী তাঁর "প্রাইভেট ইনভেস্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৯০০-১৯৩৯" বইটিতে প্রচুর তথ্য সহযোগে দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বাঙালী নতুন নতুন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হন। কিন্তু ইংরেজ-সরকার-ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ও ব্যাংকের বিরোধিতার সামনে এক রাজেন মুখার্জি ছাড়া আর কোনও বাঙালী সেদিন টিকে থাকতে পারেন নি। ইংরেজরা কলকাতায় খুচরা জিনিসপত্তর বিক্রির দোকান চালানোয়, ওইসব ছোটখাট ব্যবসার ক্ষেত্রেও বাঙালীরা দাঁড়াতে পারেনি।

ইংরেজদের বিরোধিতা ছাড়া, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতে যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীদের সাফল্যের প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীদের উদ্যোগ-প্রবণতার অভাবে পরিবারের সকলেই অংশীদার হিসাবে একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চান। যৌথ-পরিবারের বিভিন্ন লোকের আত্মীয়দেরও ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে অবহেলিত হয় পরিচালন ব্যবস্থা। আসলে পরিচালন ব্যবস্থায় বাঙালীরা প্রথম থেকেই নজর দেয়নি। ফলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রচুর টাকা উড়িয়ে মারা যাওয়ার পর দেখা গেল, তিনি অনেক দেনা রেখে গিয়েছেন, এবং ছেলেকেও শিল্প-ব্যবসা পরিচালনার উপযোগী করে তৈরি করে যাননি। সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া অন্য একটি প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন যে, ভারতে কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সাধারণত তিন পুরুষের বেশী টেঁকে না। বাঙালী শিল্প-ব্যবসায়ী পরিবার সম্পর্কেও

এ কথা সমান সত্য। কারণ প্রথম পুরুষের যে ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কষ্ট করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, সেই প্রতিষ্ঠানকে বড় করার জন্য দ্বিতীয় পুরুষ বিভিন্ন ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিদের ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসেন। এইসব ব্যক্তির কাজকর্মের ফলে প্রতিষ্ঠানটি আরও বড় হলে তৃতীয় পুরুষে পরিবারের সকলেই ওই প্রতিষ্ঠানের সব কটা দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে চান। কারণ তাঁরা বাইরের কোনো লোককে অত বেশী মাইনে দিতে ইচ্ছুক নন। পরিবারের সব কর্মক্ষম ব্যক্তি এবং তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজনের জন্য নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করতে হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠান থেকে যোগ্যতা, পরিচালন-দক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলী বিসর্জন দিতে হয়। বাঙালীদের উদ্যোগী শ্রেণী হিসাবে গড়ে তুলতে হলে বাঙালী সমাজের এই মূল্যবোধ, এই আত্মীয়-প্রীতিকে বাতিল করতে শিখতে হবে। তিন, ধান-চাষ এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কায়িক শ্রম অপমানকর বলে বিবেচিত হয়। বাঙালী সমাজ-বিজ্ঞানী আন্দ্রে বেতে'র মতে, কাদায় ধান চাষের জন্য যে ধরনের কায়িক শ্রম করতে হয়, তা কারও কাছেই আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়। এই কারণে গম-চাষ এলাকায় শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা নিজেরা মাঠে গিয়ে কাজ করলেও ওই জাতীয় ব্যক্তিদের সাধারণত ধান-চাষের সময় মাঠে দেখা যায় না। ধান-চাষ এলাকায় কায়িক শ্রম সম্পর্কে যে মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সেই মূল্যবোধের পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন। কারখানা বা ব্যবসা করার লাইসেন্স, ঋণ বা অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করলেই শিল্প বা ব্যবসা ফেঁপে উঠতে পারে না। এস-আই-এস-আইতে কয়েক সপ্তাহের 'কোরস'ও অভ্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে অসমর্থ। আবার একজনের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হলেও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ব্যক্তিদের অভ্যাস আগের মতোই থেকে যাচ্ছে। অভ্যাস বদলাচ্ছে না ব্যাংকের কর্মীর, সরকারী অফিস বা সংস্থার অফিসার ও কর্মীদের। ফলে কাজ আটকে থাকছে অন্যত্র। সরকারী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে কোনও সংস্থা জায়গা পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশানের ঋণ পেতে চাইলে ৭ বছরের জন্য ঘরের লীজ দেখাতে হয়। অথচ খিদিরপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে আপাতত দু বছরের বেশী লীজ দিয়ে কাউকে ঘর দেওয়া হচ্ছে না। প্রশাসনকে উন্নয়নমুখী করে সরকারী দপ্তর ও সংস্থার কর্মীদের চিন্তা-ভাবনা

ও কাজের অভ্যাস বদলানো হয়নি বলেই একজন যুবক বা ইনিজনীয়ার কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে এই জাতীয় হাজার রকম অসুবিধায় পড়েন। তাঁকে মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্ট শিখতে হয়, পণ্যের বাজার এবং বিক্রির পর দাম আদায়ের কথা মনে রাখতে হয়, অজস্র শ্রম-আইন, আয়কর, বিক্রয় করের সম্মুখীন হতে হয়। সর্বোপরি কী করে কর্মীদের দিয়ে কাজ করাতে হয়, অফিস পরিচালনার উপর তদারকি করতে হয়, তাও জানার দরকার হয়। অথচ কলেজে এ-সব বিষয়ে কিছুই শেখানো হয় না। শেখানো হয় কেবল যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থা। বাঙালীদের মধ্যে রাজস্থানী, গুজরাতী বেনিয়া ও অন্যান্যদের মতো শিল্প-বাণিজ্যের ঐতিহ্য থাকলে পারিবারিক সূত্রে অনেকে পরিচালন দক্ষতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেতেন, কিন্তু কোন বাঙালী উদ্যোগীর নিকট এই জাতীয় সুযোগ অনুপস্থিত। শিল্প স্থাপনে সাহায্যের জন্য টেকনিক্যাল স্কুল আছে, কিন্তু সেখানেও পরিচালনব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দানের তেমন সুযোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই ব্যাংকের ঋণের সাহায্যে ক্ষুদ্র শিল্প ও স্বয়ংনিযুক্ত কাজ আরম্ভের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যকীয় পাঠ্যতালিকা থেকে জানার উপায় নেই, ব্যাংক জিনিসটা কী এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে কী কী ভাবে ব্যাংক তাদের সাহায্য করতে পারে। নতুন ব্যবস্থায় যারা 'ভোকেশন্যাল' গ্রুপে পড়াশুনা করবে, কেবল তারাই শিল্প-স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোগী হবে, এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। সরকার যে-সব যুবককে স্ব-নির্ভরশীল হতে নানারকম সাহায্য করছেন, স্কুল-কলেজে তাদের পড়াশুনার বিষয়ের সঙ্গে ওইসব কাজের কোনোই সম্পর্ক নেই। এবং ওই কাজ শিখে নেওয়ার জন্যও সরকার তাদের কোনো রকম ব্যবস্থাও করছেন না। বাঙালী যুবকদের অন্য পেশার দিকে আকৃষ্ট করতে হলে কেবল ঋণ আর লাইসেন্স দেওয়ার কথা না বলে তাঁর এবং সেই সঙ্গে সমাজের মূল্যবোধ বদলানোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং সেজন্য ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল স্কুলের পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

[আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের (১৫ জুলাই, ১৯৭৫) পরিবর্ধিত সংস্করণ।]

বৈদেশিক ঋণের সমস্যা ১০

বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের হাত থেকে দেশের অর্থ নীতিকে চালু রাখার জন্ম পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা আমেরিকা গিয়েছেন। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে নতুন পরিকল্পনায় হাত দেওয়া তো দূরের কথা, যে-সব প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়েছে, তা-ও শেষ করা যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি বন্ধ হওয়ায় কল-কারখানায় কাজ ক্রমেই কমে যাচ্ছে, কারখানায় ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ছাটাই ও লে-অফের সংখ্যাও বাড়ছে। কাজেই অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে হলে বিদেশ থেকে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্ম নতুন বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

ঋণের বোঝা

বিদেশ থেকে ঋণ পেলেই সমস্যা দূর হয় না, প্রতি বছর সুদ ও ঋণের অংশ বিশেষও পরিশোধ করতে হয় এবং সে-টাকা দিতে হয় বৈদেশিক মুদ্রায়। অবশ্য রাশিয়া, পোলাণ্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের ঋণের সুদ ও আসল টাকায় পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকলেও ওইসব দেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করে উদ্বৃত্ত দামটা আর বৈদেশিক মুদ্রায় পাওয়া যায় না। ভারতের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩৮৬৪ কোটি টাকা। এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও পি-এল ৪৮০ বাবদ মারকিন সরকারের অ্যাকাউনটে রিজারভ ব্যাংকে মজুত টাকা ধরা হয় নি। সবচেয়ে বেশি ঋণ এসেছে মারকিন দেশ থেকে—১২৫০ কোটি টাকা। আমেরিকার পরেই রাশিয়ার স্থান—এ পর্যন্ত ৪৮৪ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। পশ্চিম জারমানি ৪৪৫ কোটি, বৃটেন ৩৫৪ কোটি টাকার ঋণ ও ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ৪৬২ কোটি এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ২৭৮ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছে।

ঋণ পরিশোধের সমস্যা

বিদেশ থেকে ভারতবর্ষ যে ঋণ ও সাহায্য পেয়েছে, তার পুরোটাই 'সাহায্য' হিসাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। যেন ওইসব টাকার সুদ দিতে বা আসল পরিশোধ করতে হয় না! সুদ ও আসল দেওয়ার দরকার হবে না, এমন সাহায্যের পরিমাণও অবশ্য কম নয়। অস্ট্রেলিয়া (১৫ কোটি), নিউজিল্যাণ্ড (৪ কোটি), নরওয়ে (সাড়ে ৪ কোটি) ও রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ তহবিল (সাড়ে ৭ কোটি টাকা) পুরোটাই সাহায্য হিসাবে দিয়েছে। কানাডা ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা ঋণ দিলেও ভারতকে খয়রাত করেছে ১৩১ কোটি টাকা। এই জাতীয় মারকিন সাহায্যের পরিমাণ ১৪৩ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে বৈদেশিক ঋণের সুদ বা আসল পরিশোধের জন্য লেগেছিল ১৯২.২ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লাগে ৫৪৭ কোটি টাকা। ১৯৬৪-৬৫ সালেই দরকার ১২১.৪ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ঋণ পরিশোধের জন্য ৫০০ কোটি এবং সুদের জন্য ৬০০ কোটি অর্থাৎ মোট ১১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দরকার হবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

আমদানির চেয়ে রপ্তানি বাড়লে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনায় ৭৭৫০ কোটি টাকা আমদানি ও ৫১০০ কোটি টাকা রপ্তানির লক্ষ্য স্থির হয়েছে। রপ্তানির লক্ষ্য পূরণ হলেও কেবল আমদানির প্রয়োজনেই অন্য সূত্র থেকে কমপক্ষে ২৬৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বাড়লেও সংকট দূর হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়

শ্রীমেহতা এখনও পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংক ও মারকিন সরকারের নিকট থেকে ভারতের জন্য নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতিও আদায় করতে সমর্থ হননি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পেলেই কি অবস্থার ইতর-বিশেষ হবে? গত বছর ভারত-সাহায্য ক্লাবের দশটি সদস্য রাষ্ট্র, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ভারতকে

৪৮৯ কোটি টাকা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু গত সেপটেম্বর মাস পর্যন্ত মাত্র ১২৭·২৩ কোটি টাকা ঋণদানের চুক্তি হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে মাত্র সাড়ে ১৪ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য ভারতে এসেছে। গত বছরের প্রতিশ্রুত ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকা এখনও নীরব। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর মারকিন আর্থিক ঋণ ও সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। মারকিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানই ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু ঋণ ও সাহায্য বন্ধ করে আমেরিকা শাস্তি দেয় ভারতকে।

প্রতিশ্রুত ঋণ কী পরিমাণে কাজে লাগানো হয়, প্রকাশিত তথ্য থেকে তার কিছুটা হদিস পাওয়া যাবে। গত বছরের সেপটেম্বর মাস পর্যন্ত ভারত যে ৩৭৬৯ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের চুক্তি স্বাক্ষর করে, তার মধ্যে কাজে লাগানো হয়েছে ২৫৩৪ কোটি টাকা এবং অর্ডার দেওয়া হয়েছে ৩১২১ কোটি টাকার মালপত্র। আমেরিকার সঙ্গে ১২৫০ কোটি টাকা ঋণের চুক্তি হলেও পণ্যদ্রব্য পাওয়া গিয়েছে মাত্র ৯৬০ কোটি টাকার। বিশ্ব ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত ৮৬৬ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬৯ কোটি টাকা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ২৭৮ টাকার মধ্যে ১৬০ কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। বৃটেন, আমেরিকা ও পশ্চিম জারমানির প্রতিশ্রুত ঋণের শতকরা ৭৮ ভাগেরও বেশি ব্যবহৃত হলেও রুশ-সাহায্যের মাত্র ৫৬·৭ শতাংশ, যুগোশ্লাভিয়ার ৩৩·৩ শতাংশ এবং চেকোশ্লোভিয়ার ১৪·৩ শতাংশ ঋণ কাজে লাগানো হয়েছে। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য রাশিয়া ১৯৫৯ সালে ৩৩ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করে কিন্তু ১৯৬৪ সালের শেষে মাত্র ২৬ ৬ কোটি টাকা কাজে লাগানো হয়। তেল অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন আরম্ভ করার জন্য ১৯৬১ সালের ফেবরুয়ারিতে প্রদত্ত ২২ লক্ষ টাকার সোভিয়েট ঋণের ২০ লক্ষ টাকা ১৯৬৪ সালের শেষেও অ-ব্যয়িত থেকে যায়।

কোন্ ধরনের ঋণ চাই

নতুন ঋণ গ্রহণের আগে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণের দ্রুত সদ্ব্যবহার এবং নতুন ঋণের ক্ষেত্রে অল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করা দরকার। ভারতের ইস্পাত, ভারীশিল্প ও তেলশিল্পের ভিত্তি স্থাপন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রাশিয়ার অবদান অনেক। পশ্চিমী দেশগুলি ও বিশ্বব্যাংক যে সময়ে শতকরা সাড়ে পাঁচ ও ছয়

টাকা সুদে ঋণ দিচ্ছিল, সেই সময়ে ভিলাই ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য শতকরা তিন টাকা হারে ঋণ দিয়ে রাশিয়া নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। সোভিয়েট ঋণ আজও ভারতের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও সময়ের ব্যবধানে ঋণের শর্ত আজ আর ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। সুদের হার ছাড়া সোভিয়েট ঋণ বার বছরে পরিশোধ করতে হয় এবং প্রকল্পের জন্য শেষ যন্ত্রপাতি আসবার এক বছর বাদেই ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হয়। অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশের ঋণের শর্তও অনেকটা এই ধরণের। রুমানিয়ার ঋণের সুদের হার শতকরা আড়াই টাকা কিন্তু সাত বছরে আসল পরিশোধ করার কথা। পোলাণ্ডের সুদের হারও শতকরা আড়াই টাকা। কিন্তু পোলাণ্ডের প্রথম দুটি ঋণ আট বছরে এবং তৃতীয় ঋণটি বার বছরে পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদন ভালভাবে শুরু হওয়ার আগেই কম্যুনিস্ট দেশগুলির অনেক ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা জোগাড় করতে হয়।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার যাবতীয় ঋণের জন্য বৎসরে শতকরা পঁচাত্তর পয়সা সারভিস চার্জ এবং দশ বছর বাদ দিয়ে পরবর্তী ৪০ বছরে টাকা শোধ দিতে হয়। ১৯৬২ সালের ফেবরুয়ারি থেকে মারকিন সরকার যে-সব ঋণ দিয়েছেন, তার সুদের হারও বছরে শতকরা পঁচাত্তর পয়সা এবং কোন কোন ঋণের মেয়াদ ৬১ বছর। এইসব ঋণে স্থাপিত প্রকল্পের আয় থেকে অতি সহজেই দেনা শোধ করা যাবে, সুদও বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। বৃটেন মাত্র গত অকটোবর থেকে বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে আরম্ভ করেছে। কাজেই নতুন ঋণ সংগ্রহের সময় একদিকে অল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ও সাধারণ ঋণ সংগ্রহ এবং অপরদিকে সোভিয়েট-ঋণের শর্ত বদলের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য রুশ-ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং সেজন্যই ঋণের শর্ত বদলের প্রশ্নটি খুবই জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সুদের হার অত্যন্ত বেশী হওয়ায় মারকিন ঋণ যাতে বিশ্ব ব্যাংকের মারফতে না আসে, সে দিকেও সতর্ক থাকতে হবে।

[আনন্দবাজার পত্রিকা। ৬ মে, ১৯৬৬।]

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস ১১

এক মাসের উপর হল কেন্দ্রীয় সরকার টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করেছেন।* এই এক মাস ভারত সরকার মূল্য হ্রাসের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের নিকট প্রচারিত নোটে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, এই মূল্য হ্রাস করার উপরেই বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া নির্ভর করছিল। ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের নিকট এ-ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডারের "একমত" হয়ে পরামর্শ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। টাকার মূল্য হ্রাসের পর সমস্যা কতটা মিটেছে, কতটা নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দুটির বক্তব্য ভারতের স্বার্থ-বিরোধী কিনা, তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কেন ডিভ্যালুয়েশন করা হয়?

রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের জন্যই সাধারণত ডিভ্যালুয়েশন করা হয়ে থাকে। কোনো দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি হতে থাকলে অনেক সময়ে ধরে নেওয়া হয় যে, ওই দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য যা হওয়া উচিত, সরকারী ধার্য-মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী এবং সেজন্য অন্যান্য দেশ ওই দেশ থেকে জিনিস কিনছে না। কাজেই রপ্তানি ঠিক মতো না হলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হতে বাধ্য। এই ধরণের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার থেকে স্বল্পকালীন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে, বৎসরের পর বৎসর ঘাটতি হতে থাকলে মুদ্রার অতিরিক্ত-ধার্যমূল্যের যুক্তিতে অন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার থেকে ওই দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমাতে বলা হয়। কারণ তখন কেবল রপ্তানিই বাড়বে না, বিদেশী পণ্যের দাম বৃদ্ধি

---

* ১৯৬৬ সালের ৬ জুন।

পাওয়ায় আমদানিও হ্রাস পাবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কমানোর এই সকল দাওয়াই কি ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল? কঠোর আমদানী নীতি সত্ত্বেও ভারতের আমদানির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বিলাসদ্রব্যের স্থান নেই বললেই চলে। ১৯৬৫ সালে ভারতের মোট ১৩৮৩ কোটি টাকার আমদানী দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি বাবদ লেগেছে ৪১৯ কোটি টাকা, লোহা ও ইস্পাত আমদানি করা হয়েছে ১০৫ কোটি টাকার এবং খাদ্যশস্যের জন্য লেগেছে ২৯০ কোটি টাকা। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করা হয়নি বলে কল-কারখানাগুলি পুরোপুরি চলেনি, অনেক ছোট কারখানা উঠে গিয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আমদানি করা হয়নি বলে আমদানী দ্রব্য বেশী দামে বিক্রি হয়। লাইসেন্সই অনেক সময়ে পাঁচগুণ বেশী দামে বিক্রি হয়ে থাকে। কাজেই বিদেশী জিনিসের দাম বাড়লে আমদানির পরিমাণ কমবে, এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। কৃষি ভিত্তিক শিল্পগুলির কাঁচামাল, যথা, পাট ও তুলো আমদানির জন্যও খরচ বাড়বে। কাজেই টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাসের ফলে টাকার হিসাবে যন্ত্রপাতির দামই কেবল বাড়বে না, উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পাবে। আর আমদানী দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের জন্য ভারতকে আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে রপ্তানি বাড়াতে হবে।

রপ্তানি কি বাড়বে?

ডিভ্যালুয়েশানের ফলে রপ্তানি বাড়বার কথা। গত বছর ভারত ৮৯০ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করেছিল। এখন ঐ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হলে রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ সাড়ে ৫৭ শতাংশ বাড়াতে হবে। টাকার হিসাবে ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণও কিন্তু ওই হারে বেড়ে গিয়েছে। আমদানী দ্রব্যের বর্তমান হার বজায় রাখা এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য রপ্তানি অনেক বাড়াতে হবে। এ-সবের পর রপ্তানি যদি আরও বাড়ে, তবেই ডিভ্যালুয়েশান ভারতের পক্ষে লাভজনক বলে গণ্য হবে। ১৯৬৫ সালে ভারত ৮১০ কোটি টাকার, পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে এবং তার মধ্যে কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে রপ্তানি হয় ১৫৩·৬ কোটি টাকার, তার আগের বছর ওই সব দেশে রপ্তানি

হয়েছিল ১৩৩ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য। পণ্য বিনিময়ের ভিত্তিতে টাকার মাধ্যমে অনেকগুলি দেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বেড়েই চলেছিল। দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মারফত রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। টাকার প্রকৃত দাম কমা সত্ত্বেও গত বছর আমেরিকা, কানাডা ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ভারত থেকে ২৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত পাট কিনেছিল। রপ্তানি যে আশানুরূপ বাড়ছে না, তার কারণ অনেক। ভারতের চা ইংলণ্ডেই বেশী যায়। কিন্তু আগের বছর অতিরিক্ত মজুত চায়ের জন্য গত বছর ভারত ও সিংহলের চায়ের রপ্তানি কমে যায়। একই কারণে ইংলণ্ডে মিলজাত বস্ত্রের রপ্তানি হ্রাস পায়। ফ্রান্স চীনের নিকট থেকে বস্ত্র কেনায় সে-দেশে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতের মিলজাত বস্ত্রের চাহিদা প্রায় একেবারেই লোপ পেতে চলেছে ভিন্ন কারণে। ওই সব দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় কেবল তুলোর তৈরি কাপড়-চোপড় লোকে আর ব্যবহার করে না। বিদেশী ব্যবসায়ীদের অর্ডারের পরিমাণ কম হলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সেই অর্ডার অনুসারে জিনিস পাঠান না, এই অভিযোগ আমি নিজে ব্যাংককের আধ-ডজন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর মুখে শুনেছি। বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনী ও বাণিজ্য-চুক্তির মারফত হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ছিল। এই সব নতুন পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি বাড়াতে সময় লাগে। তা ছাড়া, জাপানের নতুন নতুন ডিজাইনের শিল্পপণ্যের সঙ্গে সাদামাটা ভারতীয় পণ্যের কোনও প্রতিযোগিতা চলে না। কাজেই জিনিসপত্রের দাম কমলেই রপ্তানি বাড়বে, একথা বলা যায় না।

ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা আশি ভাগ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছিল। অবশিষ্ট রপ্তানী পণ্যের বিক্রি বাড়ানো যে সময়-সাপেক্ষ, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে আমদানী শুল্কের চড়া হার ও কোটা পদ্ধতির জন্য অনগ্রসর দেশের পণ্যদ্রব্য যে ওইসব দেশে বিক্রি করা যাচ্ছে না, সেকথা তো আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির বদলে রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যে-সব দেশের সঙ্গে টাকার-ভিত্তিতে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল,—টাকার মূল্য হ্রাসের পর আগে-নির্ধারিত টাকার জিনিস নিতে তারা রাজী নয়। তাদের মুদ্রার বিনিময়-মূল্যের কথা বিবেচনা করে বেশী টাকার জিনিস পাঠাতে হবে বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া

টাকার মূল্য হ্রাসের লাভটা যাতে ব্যবসায়ীদের পকেটে না যায়, সেজন্য সরকার পাট ও চা সমেত ১২টি পণ্যের উপর রপ্তানী শুল্ক বসিয়েছেন। দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে রপ্তানী শুল্ক দেওয়ার কথা ছিল না। তাই রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া সমেত পূর্ব ইউরোপের বাদবাকী দেশ বর্তমানে ভারত থেকে জিনিস কেনা বন্ধ করেছে। কাজেই টাকার ডিভ্যালুয়েশান করে লাভজনক পরিমাণে রপ্তানি বাড়ানো যাবে, একথা অন্তত একমাস বাদে বলা সম্ভব হচ্ছে না। পশ্চিম ইউরোপ ও মারকিন দেশের শুল্ক-প্রাচীরের জন্য ওইসব দেশে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ খুবই কম।

বিদেশের নজির

টাকার মূল্য হ্রাসের উপকারিতা বলতে গিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে যুগোশ্লাভিয়া ও ফরাসী দেশের নাম বার বার করা হচ্ছে। যুগোশ্লাভিয়ার অর্থনীতি ভারতের মতো এত বেশী কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি আমদানির উপর নির্ভরশীল নয়। আমদানী দ্রব্যের প্রকৃত দাম ও বাজার-দামের মধ্যে ফারাকও বেশী ছিল না। আর ফ্রান্সের সঙ্গে আফ্রিকার সতেরোটি দেশের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস পায় এবং ফ্রান্সের আমদানী কাঁচামালের বেশিরভাগ ওইসব দেশ থেকে আসে। কমনমার্কেটের শুল্ক-প্রাচীরের সুযোগও ফরাসী দেশ পায়। শিল্পোন্নত হওয়ায় বিদেশী পণ্যের দাম সামান্য বৃদ্ধি পেলেই লোকে দেশী জিনিস কিনতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের পক্ষে আমদানি হ্রাসের তেমন সুযোগ নেই। কেবল মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা যায় না, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ তো ইংলণ্ড!

টাকার মূল্য-হ্রাসের ফলে অভ্যন্তরীণ জিনিসপত্রের দামই কেবল বাড়ছে না, সমস্ত প্রকল্পের ব্যয়ই বেড়ে গিয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সার কারখানা স্থাপন করা দরকার। কিন্তু প্রস্তাবিত ছয়টি সারের কারখানার জন্যই ৫৮ কোটি টাকার অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা লাগবে। প্রতিটি শিল্পেই এইভাবে খরচ বাড়বে। কেন্দ্রীয় সরকার এ-বছর আমদানী করা সার ও খাদ্যশস্যের জন্য সাবসিডি দেবেন না বলে স্থির করেছেন। কিন্তু বছরের পর বছর এ-অবস্থা চলতে পারে না। আবার বিদেশী সহযোগিতায় যে-সব চুক্তি হয়েছিল, মূল্য হ্রাসের ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী মালিকানার হারও হ্রাস পাবে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সরকার এ-সব বিষয় আগে ভেবে দেখেননি।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে প্রস্তাবিত [illegible] হাত দেওয়া সম্ভব হবে না এবং সরকার বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে অনেক প্রকল্প ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। আমেরিকান ব্যবসায়ীরা অনেক চাপ দিয়েও নিজেদের মালিকানায় বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সুযোগ পায়নি। এবারে তারা বিশাখাপত্তমে প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সুযোগ পেতে পারে বলে মনে হচ্ছে।*

বৈদেশিক সাহায্যের হাল

টাকার বিনিময় মূল্য কমালে বিদেশী সাহায্যের দরজা খুলে যাবে বলে বলা হয়েছিল। একমাত্র আমেরিকা ছাড়া আর কেউ নতুন ঋণ দেওয়া আরম্ভ করেনি। পশ্চিম জার্মানি থেকে এ-বছর ২৫ থেকে ৫০ কোটি মার্ক পাওয়া যাবে বলে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু আপাতত ৪ কোটি মার্কের বেশী পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির কথা বলে মূল্য-হ্রাস করতে বলাও অর্থহীন। কারণ কোন্ দেশ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটে জর্জরিত নয়? ইংলণ্ড তো দশটি দেশ, ইউরোপের আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডারের দয়ার উপর নির্ভর করে আছে। বর্তমানে ইংলণ্ডের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলের সবটাই তো ধার করা। ১৯৬৫ সালের প্রথমার্দ্ধেই পশ্চিম জার্মানিকে মূলধনী ও বাণিজ্য-খাতে ৮০ কোটি ডলার ঘাটতি বরণ করতে হয়েছে। খোদ মার্কিন দেশে শুল্ক-প্রাচীর অক্ষুণ্ণ রেখেও চালানো যাচ্ছে না, অন্যান্য দেশকে ঋণ দেওয়ার পরিমাণও কমাতে হয়েছে। পৃথিবীর ৭৭টি উন্নতি-শীল দেশের মোট ঘাটতির পরিমাণ ১৯৭০ সালে ১১০০ কোটি ডলার দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে। কাজেই এ-ব্যাপারে এক ভারতকে শাস্তি দেওয়া কেন? বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অর্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তা তাদের মুখপত্রেই বলা হয়েছে থাকে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে বিশ্বে ভারতের সম্মান যে-টুকু বেড়েছিল, টাকার ডিভ্যালুয়েশনে তা কেবল ধুয়ে- মুছেই যায়নি, ভারতকে পৃথিবীর সামনে হেয় করা হয়েছে।

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১৬ জুলাই, ১৯৬৬]

---

* লেখকের এ আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়নি। তবে বোকারোর পর বিভিন্ন নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য অনেক আন্দোলন হলেও নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কাজ খুব বেশী এগোয়নি।

ডলারের পতন ১২

গত তেরো মাসের মধ্যে মারকিন ডলারের বিনিময়-মূল্য দুবার কমাতে হল। বৈদেশিক বাণিজ্যে ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমাগত ঘাটতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় বার বার সংকটের সৃষ্টি করছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট নিকসন ডলারের মূল্য ১০ ভাগ কমিয়েছেন। তার আগে অ-কম্যুনিস্ট শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর ডলারের দাম প্রথম কমানো হয় শতকরা ৭·৮৯ ভাগ। আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার স্থাপনের সময়ে ব্রেটনউডস সম্মেলনে মারকিন ডলারকে সোনার সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ধন ভাণ্ডারের সদস্য হতে হলে সদস্য-রাষ্ট্র মারকিন ডলারে বা সোনায় ঐ চাঁদা দিতে পারতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সোনার দাম বাড়ানোর জন্য বার বার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও, মারকিন সরকারের আপত্তিতে সোনার দাম বাড়ানো যায়নি। কারণ সোনার দাম বাড়ানোর অর্থ মারকিন ডলারের বিনিময় মূল্য হ্রাস। কিন্তু ১৯৬৮ সালের মারচ মাসে সোনার দাম এত চড়ে গেল যে, মারকিন সরকার তখন সোনার দুটি দাম চালু করলেন—একটি ব্যাঙ্কের লেনদেন হিসাবের এবং অপরটি খোলা বাজারে কেনাবেচার ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর ডলারের বিনিময়ে সোনা ও অন্যান্য সম্পদ দেওয়া বন্ধ হল। আগে প্রতি আউন্স সোনার দাম ঠিক ছিল ৩৫ ডলার, তেরো মাস আগে সেটা করা হয় ৩৮ ডলারে। কিন্তু গত মঙ্গলবার ডলারের দাম কমানোর ফলে ঐ সোনার দাম এখন হল ৪২·২২ ডলার। আগে আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডারে ডলারের হিসাবে সদস্যদের চাঁদা স্থির হত। ১৯৭২ সালের ২০ মার্চ থেকে ওই হিসাব ডলারের বদলে স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (S.D.R.) বা কাগুজে সোনায় হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও ডলারের সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেই সংকটের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও অন্যান্য ব্যাপারে

তখন অধিকাংশ রাষ্ট্রই মারকিন দেশ থেকে যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আমদানি করছে। আমদানি করতে হত প্রধানত মারকিন জাহাজে। তখন সকলেরই দরকার হত ডলারের। অথচ মারকিন দেশে পণ্য রপ্তানি না হলে ডলারও মিলত না। ১৯৫০ সাল থেকে মারকিন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি আরম্ভ হলে অন্যান্য দেশের পক্ষে ডলার অর্জনের পথ সুগম হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ১৯৫৮ সাল থেকে। কারণ ঐ বছর ঘাটতি বেড়ে সাড়ে তিন বিলিয়ন এবং পরের বছর প্রায় চার বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াল। ১৯৬১ সাল থেকে বিদেশে ডলার যাওয়া বন্ধ করার জন্য মারকিন সরকার অনেক ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

সংকটের মূল কারণ

মারকিন দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি থেকেই ডলারের এই সংকট। মাত্র ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মারকিন দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তার আগে ও পরে মুদ্রাস্ফীতি ও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য মারকিন পণ্যদ্রব্যের দাম জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। ওই সব দেশে মারকিন মূলধন বিনিয়োগ, শিল্পে মারকিন যন্ত্রপাতি বসানো বা মারকিন পরিচালন পদ্ধতি ও কারিগরি-বিদ্যা প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অনেক বেশী হয়। মুদ্রাস্ফীতির চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ১৯৪৯ সাল থেকে ওইসব দেশ বার বার নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের পণ্যদ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থাও সুগম করে। ফলে প্রতিযোগিতায় মারকিন পণ্যদ্রব্য আর পেরে ওঠে না। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন প্রমুখ মারকিন অর্থনীতিবিদ দীর্ঘকাল যাবৎ ডলারের মূল্য কমিয়ে* বৈদেশিক বাণিজ্যে সংকটের মোকাবিলার কথা বলে এসেছেন। তাঁদের মতে, প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা ডলারের দাম বেশি করে ধরা আছে বলে মারকিন পণ্য বিদেশে বিকোচ্ছে না। কেনেডির আমল থেকে ধারে জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা চালু করেও ডলারের শোচনীয় অধোগতি

---

* ডলারের দাম কমাও—ডঃ স্যামুয়েলসন। অনুবাদ—নিরঞ্জন হালদার। সন্দ্বট, আট নম্বর সংখ্যা। এপ্রিল-জুন ১৯৭১।

ঠেকানো যায়নি। আমেরিকা অপরকে মুদ্রার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য করলেও, নিজে এ-সমস্যাটি বরাবর এড়িয়ে গিয়েছে। বরং জাপানের ইয়েন, জারমানির মারক, ফ্রানসের ফ্রাঙ্ক, বেলজিয়ামের গিলডারের বিনিময়-মূল্য বাড়ানোর চাপ দিয়ে ঐ সব দেশের পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়াতে চেয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিকসন দুবারই ডলারের দাম কমালেন, তবে সংকটের হাবুডুবু খাওয়ার পরেই, তার আগে নয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে আমেরিকার দীর্ঘকাল যাবৎ ঘাটতির ফলে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মারকিন দেশ নীট লগ্নীকারী। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মারকিন দেশ অন্যান্য দেশের নিকট ঋণী। ডলারের মাধ্যমে এই ঋণপত্র বা কমারশিয়াল বিলস ইউরোপে এক 'ইউরো-ডলার' বাজারের* সৃষ্টি করেছে। জারমানি, জাপান, সুইজারল্যানড, ফ্রানস বা বৃটেনে গিয়ে অতিরিক্ত সুদের আশায় অথবা ফাটকাবাজির জন্য ডলার সিকিউরিটি এক দেশের বাজার থেকে অপর দেশের বাজারে অহরহ চরে বেড়ায়।

এবারের সংকট

ডলার যে নতুন সঙ্কটে পড়েছে, গত দু সপ্তাহ ধরে তা বোঝা যাচ্ছিল: সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা গিয়েছে, গত বছর জাপান, পশ্চিম জারমানি, ফ্রান্স, ও ইতালি বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত হলেও আমেরিকার ঘাটতি থেকে গিয়েছে, এ-বছরেও ঘাটতি থাকবে। গত বছর আমেরিকার যা ঘাটতি হয়েছে, জাপানের উদ্বৃত্ত তার চেয়ে অনেক বেশী। আমেরিকা জাপানী ইয়েন ও জারমান মারকের দাম বাড়ানোর জন্য চাপ দেবে, এই অনুমানে টোকিও এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে অভাবিত পরিমাণে ডলারের ভিড় জমে। জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৮ ফেবরুয়ারি টোকিয়োতে ডলারের সব কাগজ কিনে নেন, পশ্চিম জারমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংককেও বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে ডলার কিনতে হয়েছে। এই ডলারের বন্যার কাছে আত্মসমর্পণ না করার ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপের সব কয়টি দেশ ছিল এক কাট্টা।

---

*ইউরো-ডলার মারকেট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে—ঘোষ অ্যাণ্ড হালদারের "স্টাডিজ ইন মডার্ণ ব্যাংকিং"-এ। ৫ম সংকলন পৃ ৩৪৭-৩৪৯।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ডলারের দাম কমানোর সময় জারমান মারকের দাম শতকরা ১৩·৬ ভাগ এবং জাপানী ইয়েনের দাম শতকরা ১৬·৯ ভাগ বাড়ানো হয়। নির্দিষ্ট প্রতিটি মুদ্রাকে বিনিময় মূল্যের উপরে ও নিচে শতকরা ২·২৫ ভাগ ওঠা-নামা করার সুযোগ দেওয়া হয়। বৃটিশ স্টারলিং-এর দাম ঠিক থাকে। সুতরাং ডলারের তুলনায় পাউনডের দাম বাড়ে এবং ভারতের টাকা স্টারলিং-এর সঙ্গে যুক্ত* বলে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য শতকরা ৩·০৩ ভাগ বেড়ে যায়। এ ব্যবস্থা নিতান্ত সাময়িক। নূতন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা হয়. ডলারের বিনিময় মূল্য না কমিয়ে আমেরিকা একটি ব্যবস্থা করতে চায় এবং গত সেপটেম্বর মাসে নিযুক্ত কুড়িটি দেশের একটি কমিটী এ-ব্যাপারে এখনও আলোচনা চালাচ্ছে। ডলারের বিনিময় মূল্য শতকরা দশভাগ কমানোতে সমস্যা মিটছে না। আমেরিকার এখন সবচেয়ে বেশি ভয় জাপানকে নিয়ে। একদল মারকিনের ধারণা, জাপানী ইয়েনের দাম না বাড়ালে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারা যাবে না। কারণ খোদ মারকিন দেশেই দামের সুবিধার জন্য জাপানের রপ্তানি বেড়েই যাচ্ছে, বিদেশে প্রতিযোগিতাতেও মারকিন পণ্য জাপানের হাতে মার খাবে। জাপানকে বশে আনতে পারলে তখন আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপকেও দেখে নেবে। কিন্তু অত সহজে সমস্যার সমাধান হবে না। পশ্চিম ইউরোপে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও ইতালি স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত মূল্যে ডলার কেনা-বেচা করবে, কিন্তু মূলধনের লেনদেনের ক্ষেত্রে বাজার দরেই লেনদেন করতে হবে। বাজার-দরে ইয়েন বিক্রি শুরু হওয়ায় ইতিমধ্যে ইয়েনের বিনিময় মূল্য বেড়েছে। ডলারের বিনিময় মূল্য শতকরা দশ ভাগ কমিয়ে ইয়েনের দাম শতকরা ১৫ ভাগ বাড়াতে সচেষ্ট হয়ে নিকসন আপাততঃ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের কথা ভাবছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রতিটি দেশকেই প্রধান-প্রধান দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমা-বাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, জাপানের আমদানী দ্রব্য কমানোর উপায় নেই, তবে কাঁচামালের দামবাড়ার সঙ্গে রপ্তানির

---

* ভারতীয় মুদ্রার সঙ্গে স্টার্লিং-এর গাঁটছড়ার বন্ধন ছিন্ন হয় ১৯৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় রুপি এখন পুরোপুরি স্বাধীন। পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর বিনিময় মূল্য কমছে বলে ভারতীয় রুপির দাম কমানোর সুযোগ আর নেই।

সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জাপানের শিল্পের সব কাঁচামালই বিদেশ থেকে আনতে হয়। ইয়েনের দাম বাড়লে তেল, ইস্পাত ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন কোমপানির মুনাফা বাড়বে, রপ্তানী দ্রব্যের উৎপাদন খরচ কমবে না। পক্ষান্তরে রপ্তানির ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিলে জাপানে গৃহনির্মাণ, শহর-উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ বাড়বে এবং তখন মারকিন দেশকে আর আপাতত তেমন জাপানী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে না।

উন্নতিশীল দেশে প্রভাব

এই সংকট শিল্পোন্নত দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ থাকলেও অনগ্রসর দেশেও এর প্রভাব মারাত্মক। শিল্পোন্নত দেশের এই সঙ্কটের জন্য বিশ্ব বাণিজ্যে উন্নতিশীল দেশগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৬৩ সালের শতকরা ২৩ ভাগ থেকে ১৯৭০ সালে শতকরা ১৯ ভাগে কমে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডারে কাগুজে সোনার* জন্য এই সব দেশের আমদানি-বাণিজ্য খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সংকটের জন্য ওইসব দেশে আমদানী শুল্ক বাড়তে, এবং বিনাশুল্কের কোটা কমতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে মূলধনের ঋণ সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি দেশের মুদ্রা ডলার, স্টারলিং, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি মুদ্রার সঙ্গে যুক্ত। ফলে যে-কোন একটি মুদ্রার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে প্রায় প্রতিটি দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমা বা বাড়ার সঙ্গে ঐ সব দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সমস্যাও জড়িত এবং কোন দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কতটা বাড়বে বা কমবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই ধনতান্ত্রিক দেশের সমস্যার সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্কও জড়িত। ভারতের সঙ্গে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের বাণিজ্য চুক্তি টাকার ভিত্তিতে হলেও ১৯৬৬ সনে টাকার বিনিময়-মূল্য কমানোর ফলে

* কাগুজে সোনা বা স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (এস-ডি-আর) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে ঘোষ অ্যাণ্ড হালদারের "স্টাডিজ ইন মডার্ণ ব্যাংকিং" (৫ম সংস্করণ)-এ। পৃঃ ৩৪৬-৩৪৯।

রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে আগে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন করে টাকার ভিত্তিতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হয়েছিল এবং এই বাড়ানোর হার রাশিয়ার ক্ষেত্রে এক রকম, যুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে অন্য রকম ছিল। আবার স্টারলিং এবং টাকার দাম বাড়ার পর ওইসব দেশে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ কমানো যায়নি।

১৯৭১ সালের আগস্টে ডলারের বদলে সোনা দেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল হলে ভারতীয় টাকার সঙ্গে ডলারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ওই বছরের ডিসেম্বরে ডলারের দাম কমালে ভারতের মুদ্রা স্টারলিং-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। পাউণ্ড বাজার দরে বিক্রির ব্যবস্থা চালু হওয়ায় টাকার দামের ক্ষেত্রেও ওঠা-নামা আরম্ভ হয়েছে, যদিও আইনত শতকরা ২·২৫ ভাগ বেশি দামেও টাকা কেনা-বেচা হতে পারে। সুখের বিষয়, জাপান ও ইউরোপের দেশগুলির মতো ভারতের তহবিলে ডলারের অংশ অনেক কম। তাই ডলারের দাম কমায় ঐ দিক থেকে ভারতের ক্ষতি তেমন বেশি হয়নি। ডলারের দাম আরও না কমালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনা খুবই কঠিন।

[আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।]

রুপি-রুবল-স্টার্লিং

১৩

বেশ কিছুকাল যাবৎ ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ভারতীয় টাকা (রুপি) ও রুশ রুবলের বিনিময় হার নিয়ে গোপন মন-কষাকষি চলছিল, অবশেষে তা আর গোপন রাখা যায়নি। ভারতের স্বার্থ এত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে, ভারত সরকার বন্ধুদেশ হিসাবে রাশিয়ার দাবি আর মেনে নিতে পারেননি। ফলে রুশ প্রতিনিধিরা এদেশে তিন দিনের আলোচনার জন্ত এসে ১৭ মারচ থেকে ৪ এপ্রিল (১৯৭৫) পর্যন্ত আলোচনা চালিয়েও স্থিতাবস্থা বজায় রেখে দেশে ফিরে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে ডলারের বিনিময় হার কমানোর পর ভারতীয় রুপিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে ব্রিটিশ স্টার্লিং-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।* এছাড়া, রুপি ও রুবলের দাম সরকারীভাবে ঠিক হয় সোনার কত অংশের দামের সঙ্গে উভয় মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হয়েছে তার উপর। স্টার্লিং-এর সঙ্গে রুপি যুক্ত হওয়ার পর স্থির হয়: এক রুবল=৮·৩৩ টাকা। ১৯৭৫ সালের পয়লা মার্চ থেকে রাশিয়ার স্টেট ব্যাংক এক-তরফা রুবলের দাম বাড়াতে থাকে।১ ফলে তাদের নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন অ-বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এক রুবলের বিনিময় হার ১২ টাকা। অর্থাৎ রাশিয়া টাকার তুলনায় রুবলের দাম ২৭·৮ শতাংশ বাড়িয়ে নিয়েছে। রাশিয়া যুক্তি দেখায়, আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় নতুন বিনিময় হার স্থির করা হয়েছে। রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তির ১২ ধারা অনুসারে কোনও দেশ এক-তরফা কিছু স্থির করতে পারে না। এই ধারা অনুসারে কোনও কিছু পরিবর্তন করতে হলে অপরপক্ষকে জানানোর ৪৫ দিনের মধ্যে দুই দেশের বৈঠক বসাতে হবে। রাশিয়া এটা করেনি। উপরন্তু রুপির সম্পর্ক কেবল স্টার্লিং-এর সঙ্গে নয়। রুপি ও রুবলের বিনিময়-

* ভারতীয় রুপির সঙ্গে স্টার্লিং-এর এই সম্পর্ক ছিন্ন হয় ২৪ সেপটেম্বর, ১৯৭৫।

হার স্থির হয়েছিল দুই দেশের মুদ্রার মূল্যে সোনার পরিমাণের দামের ভিত্তিতে—এই ভিত্তি আজও বদল হয়নি।২ উপরন্তু রুপি দিয়ে অন্য বৈদেশিক মুদ্রা কেনা যায়, কিন্তু রুবল দিয়ে কেনা যায় না।৩ কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে টাকার বিনিময় হার কমলেও স্টার্লিং-এর হিসাবে তা ঠিক আছে, যে কারণে ভারত বাংলাদেশের টাকার বিনিময় হার বদল করছে না। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দিলে ভারত আন্তর্জাতিক ধন-ভাণ্ডার থেকে ঋণ করতে পারে এবং করে থাকে, রুবলের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সুযোগ নেই।

রুপি-রুবলের বিনিময়-হার ভারতের নিকট জীবন-মরণ সমস্যা একাধিক কারণে। বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন সবচেয়ে বেশী হয় রাশিয়ার সঙ্গে। ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ লেনদেন হয় রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গেই। রুবলের নতুন বিনিময় হার মেনে নিলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে সেই সুযোগ দিতে হবে। ১৯৭৪ সালে ভারত-রুশ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৫০ কোটি টাকা, এ বছর বেড়ে ওটা হবে ৭৫০ কোটি টাকা। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র ১৯৪৯-৫০, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৬১-৬২ সাল ছাড়া ভারত সর্বদা রাশিয়ায় অনেক বেশী পণ্য রপ্তানি করেছে। সে তুলনায় রাশিয়া ভারতে অনেক কম জিনিস পাঠাতে পেরেছে। ১৯৭১-৭২ সালে ভারতের রপ্তানি ছিল ২০৮.৭ কোটি টাকা আর রাশিয়া থেকে আমদানি হয়েছিল ৮৭.৩ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য। ১৯৭২-৭৩ সালে ভারতের রপ্তানি ৩০৪.৮ কোটি টাকা আর আমদানি ১০৫.৭ কোটি টাকার। অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে রাশিয়ার ঘাটতি ছিল ১৯৭১-৭২ সালে ১২১.৪ কোটি এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ১৯৯.১ কোটি টাকা। রাশিয়া ভারতে বেশি রপ্তানি করতে পারে না বলে প্রাক্তন যোজনামন্ত্রী ডি-পি-ধর ভারত ও রাশিয়ার প্রয়োজনীয় জিনিস দুই দেশে উৎপাদনের জন্য যুক্ত উৎপাদন কর্মসূচী রচনার চেষ্টা করেছিলেন। রাশিয়া যাতে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে বাণিজ্যে ঘাটতি কমাতে পারে, সেজন্য হঠাৎ কলকাতায় পাতাল রেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। একই কারণে ক্রুড আমদানি করে ভারতের শোধনাগারগুলিতে কেরোসিনের উৎপাদন না বাড়িয়ে গত বছর রাশিয়া থেকে ১০ লক্ষ টন কেরোসিন ও ১০ হাজার টন ডিজেল আনা হয়েছিল, এ-বছর ওই পরিমাণ কেরোসিনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার টন ডিজেল আনা হবে। ওই একই

কারণে ভারতের তামার তারের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও এবং দরকার না থাকলেও রাশিয়া থেকে এ-বছর তামার ক্যাথড আমদানির চুক্তি হয়েছিল। সম্প্রতি ওই ক্যাথডের বদলে পারা আনা হবে বলে স্থির হয়েছে।[৪]

রাশিয়ায় ভারত পাট ও পাটজাতদ্রব্য, মাইকা, উল, উলের পোশাক, তামাক, কাঁচা চামড়া ও চামড়ার জিনিস, চা, কফি, মসলা, খাবার তেল, শেলাক, জুতো, জাম-কাপড়, ফল ও ফলের রস, চীনা বাদাম, চীনা বাদামের খইল, আফিম, হস্তশিল্প, ফিল্ম প্রভৃতির সঙ্গে পাম্প, কমপ্রেশর, ফ্যান, হোসিয়ারির যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। ইস্পাত কারখানা, ওষুধ, ভারীশিল্প, তেল-শোধনাগার প্রভৃতি স্থাপনের জন্য রাশিয়া যে ঋণ দিয়েছিল, উৎপাদন আরম্ভের ১২ বছরেরর মধ্যে বার্ষিক আড়াই টাকা সুদ সমেত আসল টাকাও পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে শোধ করতে হয়। অনেকের ধারণা, দুই দেশের বাণিজ্য যখন টাকার হিসাবে, তখন রুবল-টাকার বিনিময় হার নিয়ে কী আসে যায়? কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। রাশিয়া টাকার হিসাবে জিনিস বিক্রি করলেও দাম ঠিক করে আন্তর্জাতিক বাজারের দাম অনুসারে। ফলে যে-সব লেনদেনের ক্ষেত্রে আগে ১০০ রুবলের জিনিসের জন্য ভারতকে দিতে হত ৮৩৩ টাকা, রুশ-দাবি মেনে নিলে ১০০ রুবলের জিনিসের জন্য ভারতকে আরও বেশী টাকা দিতে হবে। আবার ১০০ রুবলের বিনিময়ে রাশিয়ার পাওয়ার কথা ভারতের ৮৩৩ টাকার জিনিস, রুশ-মতলব হাসিল হলে ভারতকে আরও বেশী টাকার জিনিস দিতে হবে। ফলে দুই দিক থেকে ভারতকে ঠকতে হবে। রাশিয়া আন্তর্জাতিক দামে জিনিস বিক্রি করে। কিন্তু বাজারে ঘাটতি দেখা দিলে আগের চুক্তি অনুসারে জিনিস পাঠায় না, দামও বাড়িয়ে দেয়। গত বছর নিউজ প্রিন্টের দাম বাড়লে রাশিয়া কানাডা ও বাংলাদেশের চাইতেও বেশি দাম হেঁকেছিল।[৫] কেরোসিন ও ডিজেল আন্তর্জাতিক দামেই ভারতকে বিক্রি করছে। কিন্তু আরব দেশগুলি ও ইরান ভারতকে বিক্রি করা তেলের একটা অংশ ভারতে লগ্নী করেছে, তেল-কেনার জন্য ভারতকে ঋণ দিয়েছে এবং পেটরো-ডলারের একটা অংশও ভারত পাচ্ছে।[৬] কিন্তু রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে ঋণ দিলেও ভারতকে এ-জাতীয় ঋণ দেয়নি। একসঙ্গে এত বেশি তেল, সার প্রভৃতি কেনায় জন্য দামের দিক থেকে ভারত কোনও সুবিধা পায়নি। অথচ চীন একসঙ্গে বেশী সার কেনার জন্য জাপানের সার কম দামে পেয়েছে, বর্তমানে জাপানকে

ইস্পাতের জন্ত চুক্তির দামের চেয়ে ৪০ শতাংশ কম দাম দিতে চাইছে।

অপর দিকে কোনও কোনও জিনিস ছাড়া রাশিয়া ভারত থেকে কখনও বেশী দামে জিনিস কেনে না। রাশিয়া ভারতের চা-র জন্ত বেশী দাম দিয়েছে। রাশিয়া নীলাম থেকে চা কেনে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেও কিনে থাকে। ১৯৬৬ সালে সি-পি-আই দৈনিক "বিশাল" অন্ধ্র-এর প্রাক্তন সম্পাদক অভিযোগ করেছিলেন, রাশিয়া অনেক বেশী দাম দিয়ে অন্ধ্রের অনেক পচা তামাক কিনেছে। রাজনৈতিক কারণেই বেশি দাম দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগ ছিল। রাশিয়া অনেক সময় চাপ দিয়ে ভারতীয় পণ্যের দাম কমিয়ে থাকে। ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ড: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কিছু পাটজাত দ্রব্যের উপর থেকে রফতানি কর কমিয়ে রাশিয়াকে কম দামে ভারতের পাটজাত দ্রব্য কিনতে সাহায্য করেছিলেন। অথচ রাশিয়ার ভারত থেকে না কিনে উপায় ছিল না, বাংলাদেশও রাশিয়ার চাহিদা মেটাতে পারত না। ভারত সরকারের হয়ে যাঁরা রুপি-বাণিজ্যের চুক্তি করেন, তারা কেবল রপ্তানি বাড়ানোর কথা ভাবেন, দেশের কথা ততটা ভাবেন না। ফলে বর্তমানে ভারতকে প্রতি ওয়াগনে ৭৫ হাজার টাকা লোকসান দিয়ে যুগোশ্লাভিয়ায় ওয়াগন পাঠাতে হচ্ছে।৭ প্রথমে বলা হয়েছিল, রুপি-রুবলের নতুন বিনিময় হার (১০০ রুবল= ১২০০ টাকা) বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যে-সমস্ত ভারতীয় রাশিয়া যাবে, রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের খরচ, ভারতকে দেওয়া রাশিয়ার কারিগরি সার্ভিসের ব্যয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন হারে টাকা দিতে হবে। এইসব বাবদে ভারতের ব্যয় কিছু কম নয়। ভারতে রাশিয়া যে-টাকা খরচ করবে, তার জন্ত তাকে আগের চেয়ে কম রুবল ব্যয় করতে হবে! আবার বোকারোর ইস্পাত কারখানা ও মথুরার তেল শোধনগারের জন্ত কারিগরী সার্ভিসের জন্ত রুশ-পাওনা কম নয়। তাছাড়া, রাশিয়া থেকে ভারতের সামরিক সরঞ্জাম আমদানিও বাণিজ্যিক লেনদেনের বাইরে পড়ে। বর্তমানে রাশিয়াই ভারতের প্রধান সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী। ফলে এ বাবদে ব্যয় অনেক বাড়বে।৮ রাশিয়া ভারতকে দেয়-ঋণের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে রুবলের নতুন বিনিময় হার প্রয়োগের কথা বলায় রুশ ঋণের জন্ত ভারতকে প্রায় অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকার মতো দিতে হবে।৯ আমেরিকার সঙ্গে পি-এল-৪৮০ তহবিলের টাকা পরিশোধের চুক্তিতে ১৯৬৬ সালে ডলারের তুলনায়

টাকার দাম কমানোর কথা ভেবে ডলারের হিসাবে টাকার অঙ্ক কিন্তু বাড়ানো হয়নি। রাশিয়া প্রথমে অ-বাণিজ্যিক লেনদেনের নাম করে রুবলের দাম যে বাড়াতে চেয়েছিল, মার্চ-এপ্রিলে দুই দেশের মধ্যে আলোচনার সময় তা ধরা পড়ে। ১৯৬৬ সালে ভারত টাকার দাম কমিয়েছিল মার্কিন চাপে, কিন্তু ভারতের স্বার্থের কথা ভেবে। ভেবেছিল, টাকার দাম কমালে অনেক বেশী বৈদেশিক ঋণ পাবে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যও বাড়বে। রাশিয়াও টাকার সেই ডি-ভ্যালুয়েশানের সুযোগ গ্রহণ করেছিল। টাকার দাম কমিয়ে ভারতকে শোষণ করার একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯২৪ সালে। ইংরেজ শাসক ১ টাকার সমান ১ শিলিং ৪ পেন্স না করে ২ শিলিং করেছিল, পরে ওটা কমিয়ে ১৯২৭ সালে ১ শিলিং ৬ পেন্স করে। ওইভাবে টাকার দাম কমানো নিয়ে কংগ্রেস সেদিন রূপি-স্টার্লিং বিনিময়-হারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, অনাথ গোপাল সেনের "টাকার কথা" বইটি এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়তে পারে। তখন ভারত ছিল পরাধীন, এখন স্বাধীন। এখন ইংলণ্ডের ভূমিকা নিয়েছে রাশিয়া।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ এপ্রিল, ১৯৭৫]

পাদটীকা

১. ১৯৭৪ সালের ১লা মার্চ থেকে সোভিয়েট স্টেট ব্যাংক প্রতিমাসে রুপি-রুবলের বিনিময় হার বদলাচ্ছে। ফলে ১ জুন বিনিময় হার দাঁড়ায় ১০০ টাকা=৯.৫৫ রুবল। ভারত সরকার তার প্রতিবাদ জানান। The Government of India has······opposed this unilateral step of the USSR, because it can affect the Indo-Soviet transactions that do not fall within the framework of the rupee trade and payments agreement. INDIA PROTESTS—ROUBLE RATE CHANGE. Economic Times. September 14, 1974 দুঃখের বিষয় কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ভারত সরকারের এই প্রতিবাদের বিষয়, একেবারেই ছাপা হয়নি। ১৯৭৬ সালের মে মাসেও রুপি-রুবল বিনিময় হারের মীমাংসা হয় না। জুন মাসে ভারত সরকারের এক প্রতিনিধিদল এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য মস্কো যাচ্ছেন। কলকাতার কোনো বাংলা দৈনিকে এ-খবর ছাপা হয়নি। (স্টেটসম্যান, ৫ এবং ২০ মে, ১৯৭৬)।

২. "While the basis of gold content of rupee is clearly defined, the "gold content" of the currencies of the East European countries is fixed unilaterally by them without a clearly defined basis. At the time of signing trade agreements, these countries prescribe a rate of exchange with the rupee supposedly on the basis of the gold content of their currencies."

[INDIA PROTESTS—ROUBLE RATE CHANGE. Economic Times. September 14,1974].

৩. "The exchange rate of the rouble vis-a-vis other major world currencies is determined by the Soviet Union quite arbitrarily to suit the exigencies of its foreign trade. Thus, the cross rates of the rouble vis-a-vis other prominent currencies are rarely in alignment and one gets varying cross rates for the rouble depending on the particular foreign currency chosen for working out the cross rates." Rupee-Rouble Tussle—Economic and Political weekly, April 5, 1975.

৪. পারা আমদানি ১৯৭৫ সালের বাণিজ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং ভারতে তামার ক্যাথড পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু এ বছর তামার ক্যাথড দরকার না হওয়ায়, অর্থাৎ এ দেশে উৎপাদিত তামার তার তামার ক্যাথডের চেয়ে উন্নত হওয়ায়, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ক্যাথডের বদলে পারা পাঠাতে বলেছে। (ইকনমিক টাইমস, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৫)।

৫. ১৯৭৩--৪ সালে অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নিউজপ্রিন্টের সঙ্কট দেখা দিলে রাশিয়াও ভারতের প্রয়োজন অনুসারে নিউজপ্রিন্ট দিতে তো রাজী হয়ই না, টন পিছু নিউজপ্রিন্টের দামও বাড়িয়ে দেয়।

৬. তেলের রয়ালটি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের মাধ্যমে গরিব দেশগুলিতে শতকরা আড়াই টাকা সুদে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৯৭৪ সালে ভারতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪০ কোটি এস-ডি-আর, কিন্তু ভারত ঋণ নিয়েছিল ২০ কোটি এস-ডি-আর অর্থাৎ ১৮০ কোটি

টাকা। ১৯৭৫ সালে ভারতের জন্য বরাদ্দ করে ৬৭ কোটি এস-ডি-আর কিন্তু ভারত চায় ১৫ কোটি এস-ডি-আর। (কে প্রসাদ: রিসাইকলিং অব পেট্রো-ডলারস। ইকনমিক টাইমস, ২৬ মার্চ, ১৯৭৫।)

৭. যুগোশ্লাভিয়াকে ১৮৭৫টি ওয়াগন সরবরাহের জন্য এক চুক্তি হয়, বার্ণ ও ইণ্ডিয়ান স্টাণ্ডার্ড ওয়াগন ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে আসার পর হিসাব করলে দেখা যায় যে, ওয়াগন রপ্তানি করতে হলে কোম্পানির ওয়াগন পিছু ৭৫ হাজার টাকা লোকসান। সেজন্য যুগোশ্লাভিয়াকে ৬০০টি ওয়াগন বিক্রির জন্য নতুন চুক্তি হয়। ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ সাংবাদিক বৈঠকে বার্ণ ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগনের চেয়ারম্যান শ্রীআর-সি-দত্তের বিবৃতি। হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড, ৭ মার্চ, ১৯৭৫।

৮. রাশিয়া থেকে প্রতি বছর কী পরিমাণ টাকার সামরিক সরঞ্জাম আনা হয়, তার কোনও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ডঃ আশা দাতার রাশিয়া থেকে ভারতের আমদানির পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়ায় প্রকাশিত পরিসংখ্যানের ফারাক দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন, ওই পার্থক্যটা অস্ত্রশস্ত্র বাবদ মূল্যের জন্য হবে। ভারতে রুশ-রপ্তানির ক্ষেত্রে টাকার হিসাবে দুই দেশের প্রকাশিত হিসাবের পার্থক্য: ১৯৬০ সালে ৮·৭৩ কোটি টাকা, ১৯৬১ সালে ১১·০৬ কোটি টাকা, ১৯৬২ সালে ১২·৯৬ কোটি টাকা, ১৯৬৩ সালে ৫৩·১৪ কোটি টাকা, ১৯৬৪ সালে ৪৬·০২ কোটি টাকা, ১৯৬৫ সালে ৩২·৪৮ কোটি টাকা ডঃ আশা দাতারের বইতে ১৯৬৫ সালের পর আর কোনো তথ্য নেই। অবশ্য রাশিয়া থেকে ভারতে পণ্য আমদানির হিসাবে জাহাজে মাল তোলা ও মাল খালাসের খরচ, ইনসিওরেন্স এবং জাহাজ-ভাড়া ধরা থাকে, কিন্তু রাশিয়ান হিসাবে কেবল বিক্রির দাম ধরা হয়। সে দিক থেকে দেখতে গেলে একই মালের জন্য রাশিয়ায় প্রকাশিত রপ্তানির দ্রব্যের দাম, ওই মালের জন্য ভারতে প্রকাশিত দামের চেয়ে কম হওয়ার কথা। —Dr. Asha Datar: India's Economic Relation with the USSR and Eastern Europe, 1953-1969. P. 116

৯. "The exchange rate is also relevant in respect of loans received in the past." Rupee-Rouble Tussle: Economic

and Political weekly, April 5, 1965.

"The matter is important since the "complexities" mentioned last year are believed to have arisen out of the Russian demand that the exchange rate fixed by them apply to repayment of outstanding credits and to the repayment of goods imported. As according to Soviet calculations, the rouble stood revalued by around 39% since 1972 until April last year, the burden on India would amount to several hundred crores of rupees." (Statesman. May 20, 1976. P1.)
এ খবরটি কলকাতার কোনো বাংলা দৈনিকে বের হয়নি।

রুশ বন্ধুত্বের দায় ১৪

রাশিয়া গত বছর থেকে ভারতের সঙ্গে অবাণিজ্যিক লেন দেনের ক্ষেত্রে এক-তরফা বার বার রুবলের দাম বাড়িয়ে ১০০ রুবলের সমান ৮৩৩ টাকা থেকে এখন ১২০০ টাকা দাবি করছে। গত পয়লা মার্চ থেকে বাণিজ্যিক লেনদেনের বেলাতেও রাশিয়া একইভাবে রুপি-রুবলের নতুন হার করেছে ১০০ রুবলের সমান ৮৬৬ টাকা। রুপি-রুবলের বিনিময় হার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মন কষাকষি১ অনেক জিনিসকে সামনে নিয়ে এসেছে। যেমন,একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের ফলে ঋণের জন্য ভারত অনেক দেশের দ্বারস্থ হচ্ছে, অথচ টাকার ভিত্তিতে লেনদেন করায় রাশিয়ার কাছে প্রতি বছরই অনেক টাকা পাওনা থাকছে এবং সেজন্য ভারতকে অনেক জিনিস আমদানি করতে হচ্ছে। ভারত টাকার বিনিময়ে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে যত পণ্য বিক্রি করে, তার ২৬ শতাংশ সরাসরি পশ্চিমী দেশে বিক্রি করে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। রুপি-রুবলের পরিবর্তিত বিনিময় হারের প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, একবার টাকার দাম কমালে অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে টাকার ভিত্তিতে বাণিজ্যে ভারতকে আরও ঠকতে হবে।

ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য রুশ-ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় অনেকেই সাহস পান না।২ কারণ, একদিকে আমেরিকা বরাবরই ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি ও ভারত সরকারের বিরোধী এবং ভারতকে দলে না পাওয়ায়, উপ-মহাদেশে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টির তাগিদে সর্বদা পাকিস্তানকে মদত দিয়ে থাকে। অপরদিকে মারকিন শত্রুতার সামনে ভারতকে রাশিয়া বহুবার মদত দিয়েছে। এজন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাই নাকি রুশ-বন্ধুত্বের মধ্যে চিঁড় ধরানোর ষড়যন্ত্র এবং আমেরিকা বা সি-আই-এ'র এজেন্টগিরি করা। এই জাতীয় রাজনৈতিক প্রচার যত বেশী হবে, এদেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার তত বেশী লাভ হবে এবং রাজ-

নৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রভাব বাড়বে। আবার আমেরিকা ভারত সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরোধী হওয়ায় এদেশে রাজ্যে বা কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকেও শাসকদল কত সহজেই সি-আই-এ'র ষড়যন্ত্র বলতে পারেন। এই বিশেষ পরিবেশের জন্য সামরিক তথ্য সংগ্রহের অভিযোগে দিল্লির রুশ-দূতাবাসের সহকারী মিলিটারি অ্যাটাশে মেজর আই-ভি কানাভস্কিকে এদেশ থেকে বহিষ্কারের ৩ কথা শ্রীস্বর্ণ সিং গত ২৬ মারচ লোকসভায় ঘোষণা করলেও প্রিয় দাশমুন্সী জাতীয় ব্যক্তিরা মুখে কুলুপ এঁটে দেন।৪

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া যে ভারতের বন্ধু, এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ খুবই কম। কাশ্মীর, গোয়া ও বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ভারতের হয়ে ভেটো দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়া ভারতকে প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করে, এখনও প্রধানত রাশিয়াই ভারতের অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। রাশিয়া ১৯৫৫ সালে আড়াই শতাংশ হারে ১২ বছরে পরিশোধযোগ্য ঋণ দিয়ে ভিলাই ইস্পাত কারখানা স্থাপনে সাহায্য করে। তারপর থেকেই ভারতের শিল্পোন্নয়নে নামমাত্র সুদে বা বিনা সুদে আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন প্রভৃতি দেশের অনেক দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে তেলশিল্প, ভারী শিল্প, ভেষজ শিল্প ও বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপনে রুশ-সাহায্যও স্মরণীয়। এ ছাড়া, পঞ্চাশ দশকে রুপির ভিত্তিতে বাণিজ্যের ব্যবস্থা চালু হলে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে ভারতীয় ভোগ্যপণ্যের রপ্তানি বাড়তে থাকে, রপ্তানির ব্যাপারে ভারতের অনিশ্চয়তাও বহুলাংশে দূর হয়। এইসব সাহায্যের জন্য আমরা নিশ্চয়ই রাশিয়ার নিকট কৃতজ্ঞ এবং আমেরিকা ও চীনের ভারত বিরোধিতার জন্য রাশিয়াকে ভারতের পাশে নিশ্চয়ই চাই। দুই বৃহৎ শক্তি একই সঙ্গে ভারতের প্রতি বিমুখ হলে কী হয়, তা আমরা ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ে ৫ ও তারপরে পাকিস্তানকেও রুশ-অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের সমর্থনে রাশিয়াকে দেখা যায়নি, দেখা গিয়েছিল মালয়েশিয়াকে।

কিন্তু কৃতজ্ঞতাবোধ কি কেবল ভারতের বেলায় প্রযোজ্য, রাশিয়ার বেলায় নয়? একা রাশিয়াই কি ভারতের বিপদের দিনে প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ

করেছে? ভারত কি একাধিকবার রাশিয়ার পাশে একক ছিল না। বার্লিন ব্লকেডের সময় ভারত রাশিয়ার নিন্দা করেনি। কোরিয়া যুদ্ধের সময় ভারতের সমর্থনের আশায় আমেরিকা চীনের বদলে ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করতে চেয়েছিল। ভারত সে-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ৬ এবং রুশ-সমর্থনপুষ্ট উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলে নিন্দা করতে রাজী হয়নি। এই ঘটনায় আমেরিকা ১৯৫১ সালে ভারতকে ২০ লক্ষ টন গম বিক্রি করতে ছ মাসেরও বেশী সময় নিয়েছিল ৭। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে গণ-অভ্যুত্থানের দমনের জন্য চীন সমেত অনেক কম্যুনিস্ট পার্টি রাশিয়ার নিন্দা করলেও নিরাপত্তা পরিষদে কৃষ্ণ মেনন রাশিয়াকেই সমর্থন করেছিলেন। হাঙ্গেরির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরে নজ রুশ-বন্দী শিবিরে নিহত হলেও ভারত রাশিয়ার নিন্দা করেনি। ১৯৬৮ সালে রুশ-বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়া পদানত করলে অনেক ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতা এবং সদস্যও রাশিয়ার নিন্দা করেন কিন্তু ভারত নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়াকে নিন্দা করতে রাজী হয়নি। রাশিয়া যে ১৯৭১ সালে ভারতকে মদত দিয়েছে, তা কি কেবল ভারতের স্বার্থে? রাশিয়ার স্বার্থ ছিল না? স্বাধীন বাংলাদেশ এই এলাকায় মার্কিন প্রভাব হ্রাস করবে এবং যুদ্ধের জন্য রাশিয়া সমরাস্ত্র বিক্রি করবে, এ-চিন্তা কি একেবারেই ছিল না?

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্যের জন্য আমরা নিশ্চয়ই রাশিয়ার নিকট ঋণী। কিন্তু এ-ব্যাপারে রাশিয়ার স্বার্থও কম ছিল না। সরকারী মালিকানায় ইস্পাত, তেল ও ভেষজ শিল্প স্থাপনে সাহায্য করে রাশিয়া ভারত থেকে পশ্চিমী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হটাতে চেয়েছিল। এটা তার বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ। তাছাড়া, রাশিয়ায় তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বিদেশে তার বাজারও দরকার। ভারতে বিদেশী তেল-কোম্পানিগুলির প্রভাব খর্ব হয়েছে বলেই বিক্রির জন্য কোনও খরচ বা মূলধন লগ্নী ৮ না করে রাশিয়ার পক্ষে এদেশে বছরে ১০ লক্ষ টন কেরোসিন বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে। বোকারো ইস্পাত কারখানার কনসালট্যান্ট পদ থেকে এম. এন. দস্তুর অ্যাণ্ড কোম্পানিকে চাপ দিয়ে সরিয়ে রাশিয়া নিজে ওই দায়িত্ব নিতে ৯ পারায়, রাশিয়া প্রায় একই সঙ্গে আরও ছটি দেশে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কনট্রাক্ট পায়। আর এসব চুক্তি মানেই কেবল নিজের দেশের জিনিস বিক্রি নয়, পূর্ব ইউরোপের জিনিসও বিক্রি ১০। দুঃখের বিষয়, মার্কিণ ঋণপ্রাপ্তির

কথা ভেবে যাঁরা বোকারোতে ভারতীয় কনসালট্যান্ট নিয়োগের ব্যাপারে সরব ছিলেন, রুশ-ঋণের সময়ে ওই পদে রুশ সরকারী সংস্থা নিয়োগে তারা একেবারেই নীরব। তাছাড়া, রাশিয়ার যন্ত্রপাতির জন্য পৃথিবীর অন্যত্র শস্তা দাম অপেক্ষা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশী দাম দিতে হয়। বোকারো বা বারুণী শোধনাগার স্থাপনের খরচ পর্যালোচনা করে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য প্রকল্প-ভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলির যন্ত্রপাতির জন্য ওই রকম বেশী দাম দিতে হয় ১১। কোন টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শ ছাড়াই ভারত সরকারের ইস্পাত মন্ত্রণালয় রাশিয়ার সঙ্গে বোকারোর ব্যাপারে চুক্তি করায় ১২ ভারতকে রাশিয়ার রিফ্রাকটরি কিনতে হয়েছে অথচ সেই সময়ে চাহিদার অভাবে ভারতে রিফ্রাকটরির উৎপাদন কমাতে হয়। এই ধরণের অজস্র উদাহরণ মিলবে।

১৯৫৫ সালে দেওয়া রুশ-ঋণের শর্ত ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও আজ আর তা নেই। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার যাবতীয় ঋণের জন্য বছরে শতকরা ৭৫ পয়সা সারভিস চার্জ এবং ১০ বছর বাদে পরবর্তী ৪০ বছরে টাকা শোধ দিতে হয়। ১৯৬২ সাল থেকে মারকিন সরকার যে-সব ঋণ দিয়েছেন, তার সুদের হারও বছরে ৭৫ পয়সা এবং কোনো কোনো ঋণের মেয়াদ ৬১ বছর। ১৯৬৫ সালের অকটোবর থেকে বৃটেন বিনা সুদে ৪০ বছরে পরিশোধযোগ্য "কিপিং লোন" দিচ্ছে। বৃটেন, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কাছ থেকে ভারত গ্রাণ্ট হিসাবে যে সাহায্য পেয়েছে, তার পরিমাণও কম নয়। গত বছর পর্যন্ত ভারত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দেশ ও সংস্থা থেকে যে-ঋণ পেয়েছে, তার হিসাব ১৩ নিচে দেওয়া হল: আমেরিকা-৪১৪২·৮৭ কোটি, বৃটেন—১২০১·৭৮ কোটি, পশ্চিম জারমানি—৭৯৭·২৪ কোটি, রাশিয়া ৭৩৭·৬৩ কোটি, জাপান ৫২০·৮২ কোটি, কানাডা ৩৭৯·৪৩ কোটি (এর মধ্যে ২০৭·৭৯ কোটি টাকা ১০ বছর বাদ দিয়ে পরবর্তী ৪০ বছরে শোধ দিতে হবে। সারভিস চারজ বছরে শতকরা ৭৫ পয়সা), চেকোস্লোভাকিয়া—১৬৬·১০ কোটি, যুগোস্লাভিয়া—৫০·২১ কোটি, হল্যাণ্ড—১১৩·০২ কোটি, নিউজিল্যাণ্ড ৯৩·৩৮ কোটি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ২০০৭·২৩ কোটি টাকা এবং বিশ্ব ব্যাংক—৩৪৪·৯৪ কোটি টাকা। রাশিয়া সমেত কোনও কম্যুনিস্ট দেশের ঋণের সুদ আড়াই শতাংশের কম নয় এবং তা ১২ বছরের মধ্যে শোধ দিতে হয়।

এক ধরনের হীনমন্যতার মনোভাব দ্বারা চালিত বলেই আমরা বন্ধু বলে রাশিয়ার জন্য ত্যাগ স্বীকার করছি অথচ একই কারণে রাশিয়ার ত্যাগ স্বীকারের প্রশ্ন উঠছে না।

[আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩ ও ১৫ মে, ১৯৭৫]

পাদটীকা:

১. রাশিয়া এক তরফাভাবে রুপির তুলনায় রুবলের বিনিময়ের-হার বাড়িয়ে নেওয়ায় এ-বিষয়ে দুই দেশের প্রথম বৈঠক হয় মস্কোতে ১৯৭৪ সালের জুনে, তারপর রুশ-প্রতিনিধিরা মাত্র তিনদিনের জন্য আলোচনা করতে দিল্লিতে এলেও ১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত আলোচনা করেও কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছানো সম্ভব হয়নি। ২০ মের (১৯৭৬) স্টেটসম্যানে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ভারতের অর্থ-মন্ত্রকের এক প্রতিনিধি দল মস্কোতে যাবেন রুপি-রুবলের বিনিময় হার আলোচনা করতে।

২. কুৎসা রটনার ভয়ে কোনও সম্পাদক বা আর কোনও সাংবাদিক ভারতের অন্য কোনও দৈনিকে স্বনামে রুপি-রুবলের বিনিময় হার নিয়ে ভারত সরকারের সপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে সাহস করেননি।

৩. প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং সামরিক তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত আই-ভি-কানাভসকির নাম পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন। (স্টেটসম্যান, মার্চ ২৭, ১৯৭৫)।

৪. মজার ব্যাপার, কলকাতার কোনো বাংলা দৈনিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি প্রকাশিত হয়নি, যদিও ওই রুশ কূটনীতিককে সামরিক তথ্য সরবরাহের অপরাধে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন স্কোয়াড্রন-লীডারকে সামরিক আদালতে শাস্তি দেওয়া হয়।

৫. ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া দুই দেশেই অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যদিও পাকিস্তান ছিল আক্রমণকারী।

৬. আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতা স্যার বেনেগাল নরসিং রাওয়ের মাধ্যমে ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার প্রস্তাব দেয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্যার নরসিং রাওকে জানান, ভারত চীনের বদলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে চায় না।

৭. The Nehru Government asked Washington for two million tons of grain. The request came before a Congress piqued over Nehru's criticism of the West and particularly America. For more than six months, Nehru's request was sidetracked and delayed. Hernando T. Abaya : The Untold Philippine Story. (Manila). P. 109.

৮. পেট্রোলিয়ামজাত কোনও দ্রব্য বিক্রি করতে হলে, তা মজুত করা ও পরিবহণের জন্য বিশেষ মূলধন বিনিয়োগের দরকার হয়।

৯. রাশিয়াকে কী ভাবে বোকারোর ইস্পাত কারখানার কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, সে-কাহিনী পদ্মা দেশাই "দি বোকারো স্টীল প্লান্ট" পুস্তিকায় বিবৃত করেছেন। রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে বোকারোর নির্মাণ কার্যে খরচ কী ভাবে বেড়েছে, তার একটা বিবরণ আছে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ১৮ মে (১৯৭০) সংখ্যায় "Halting Progress cost Bokaro..." প্রবন্ধে। কারখানা নির্মাণের খরচ বাড়লে সেই কারখানার উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন-খরচ আপনা থেকেই বেড়ে যায়।

লোকসভায় বেকারো চুক্তি অনুমোদনের দিনে এক সময় মাত্র ২৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৮ মে, ১৯৭০)। ওই আলোচনায় সি-পি-এমের একজন সদস্যও উপস্থিত না থাকায় সি-পি-এম নেতৃত্ব পরে পার্লামেন্টারি গোষ্ঠীর কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

১০. যেমন, রাশিয়া বোকারোতে ইস্পাত-কারখানা স্থাপনের দায়িত্ব নিয়েছে। আর ওই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক্যাল ওয়েলডিং মেশিন আমদানি করতে হয়েছে পূর্ব জারমানি থেকে।

১১. "Prices of East European machinery may in many cases be 15-20 per cent higher than the cheapest source. However, there is no evident that prices charged by East Europeans are higher than in case of tied credit from

elsewhere"—Dr. Asha Datar : *India's Economic Relations With the USSR and Eastern Europe, 1953-1969. P. 266.*

১২. কেন্দ্রীয় ইস্পাত দপ্তরের সেক্রেটারি ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (DPR) তৈরির আগেই প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা নির্মাণের সব ভার রাশিয়াকে দিয়ে ১৯৬৪ সালের ১৩ অকটোবর রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেন। দ্রষ্টব্য—Halting Progress costs Bokaro 25 lakhs a month. By a Special Correspondent. Hindusthan Standard, May 18, 1970.

কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ ছাড়া চুক্তি করায় বোকারোতে কর্মরত রাশিয়ানদের জন্য ভারতের ব্যয় একেবারেই অগ্রাহ্য করার মতো নয়—"For the Soviet specialists, Bokaro Steel would have to pay salaries (in Roubles) ranging from Roubles 116 to 380 per month, together with an allowance ranging from Rs. 44 to 83 per day, transfer allowance for specialists ranging from Rs. 400 to 750, first class air travel for specialist and his family with up to 240 kg. of baggage per family, first class air-travel on leave once in two years, hotel and travel between Delhi and Bokaro on the way to Moscow and back, insurance, all business travel in India, business trunk-calls and cables in India, cars, air conditioned and furnished offices, air conditioned and fully appointed accomodation, medical expenses, including hospitalisation, full pay during sickness, provision of schools, clubs and excursion facilities, etc., all free of taxes."— Cost Reduction Study, P. 30. Quoted in "The Bokaro Steel Plant" by Padma Desai. P. 66. ইংরেজ আমলে বড় বড় সাহেবদের যে-সব সুবিধা দেওয়া হত, বোকারোতে কর্মরত রুশদের সেই জাতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হয়, যা তারা দেশেও পায় না। এখানে বোকারোতে কর্মরত রাশিয়ানদের চাকরির শর্তের কথা আছে। কিন্তু তাঁরা কেবল মাসিক বেতন কত পান? "রাশিয়ান টেকনিসিয়ানদের বেতনের খুঁটিনাটি হিসাব দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, সরকারী

মালিকানায় ইস্পাত কারখানায় রাশিয়ান চীফ ইঞ্জিনীয়াররা সবচেয়ে বেশী বেতন পান—৭,০৬৬ টাকা, সব চেয়ে কম মাহিনার রাশিয়ানের বেতন মাসে ২,৬৩৩ টাকা।" (স্টেটসম্যান, ৬ মে, ১৯৭০)। সন্ত পাস করা ইঞ্জিনীয়ারেরা যে-কাজ করেন, সে-কাজেও নিযুক্ত থেকে রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়াররা অত বেশী মাইনে পেত। এর উপর তাঁদের জন্ত দো-ভাষীর খরচ আছে।

১৩. Explanatory Memorandum of the Budgets of the Government of India for 1975-76. P. 123—134.

পরিশিষ্ট—১

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ভাবনা

গান্ধীজীর অর্থনীতি চিন্তাধারা সম্পর্কে পশ্চিমী অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে গড়ে ওঠা ব্যক্তিদের মতামত মোটেই সুখকর নয়। ধনতান্ত্রিক, মিশ্র-অর্থনৈতিক ও কম্যুনিস্ট অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই গান্ধীজীর অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও মতামতকে ইতিহাসের চাকা পিছনের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বলে অভিহিত করে থাকেন। গান্ধীজীর 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের ধারণা' গ্রাম-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষি, চরকা, খাদি ও কুটিরশিল্পের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব, ভারীশিল্পকে অবহেলা প্রভৃতি চিন্তা-ভাবনা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মতবাদে বিশ্বাসীরা কখনও ভাল চোখে দেখেননি। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা গান্ধীজীকে "প্রতিক্রিয়াশীল," "বিপ্লব-বিরোধী", 'ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্য বাদের দালাল'' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এই ভুল ধারণা সৃষ্টির পিছনে দুই পক্ষেরই কিছুটা ভূমিকা আছে। পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরা যে ভাষায় কথা বলেন, গান্ধীজী বা তাঁর সমর্থকেরা তাঁদের বক্তব্য সেই ভাষায় প্রকাশ করেননি। জনবহুল ও মূলধন ঘাটতির দেশে কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে চরকার প্রয়োজনীয়তার কথা না বলে তিনি চরকাকে দেশপ্রেমের সঙ্গে এক করে দেখাতে চেয়েছিলেন। এই জাতীয় যুক্তি এবং সেইসঙ্গে গান্ধীজী অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলায় দুই তরফে ভুল বোঝাবুঝি বেড়েই গিয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি এবং শহরের ভূমিকা গান্ধীজী সরাসরি অস্বীকার করায় এই বিপত্তি ঘটে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটা বইতে অধ্যাপক অম্লান দত্ত ১ গান্ধীজীকে একজন বিশিষ্ট অর্থনৈতিক চিন্তানায়ক হিসাবে অভিহিত করেছেন। ডঃ অমর্ত্যাত্মজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ও অধ্যাপক অম্লান দত্ত গান্ধীজীর অনেক অর্থ-নৈতিক মতামত অর্থনীতিকদের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যে-কোন অর্থনৈতিক

চিন্তাধারাকে তার সমসাময়িক যুগ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। অ্যাডাম স্মিথ, রিকারডো, মার্কস বা ফ্রেডারিক লিস্ট প্রসঙ্গে সে কথা মনে রাখলেও গান্ধীজীর প্রসঙ্গে আমরা তা ভাবতে চাইনা। গান্ধীজী যে সমাজে জন্মেছিলেন তিনি কিন্তু সেই সমাজ টিঁকিয়ে রাখতে চাননি। চরকা, খাদি, গো-সেবা, কায়িক শ্রমের অভ্যাস, শিক্ষার প্রসার, অস্পৃশ্যতার অবসান, খাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা প্রভৃতি গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে গান্ধীজী এক নতুন ধরনের সমাজ গঠনের কথা বলেছিলেন। স্বাধীনতা বা ক্ষমতালাভের পর সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধীজী বসে থাকেননি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্বার্থেই এদেশে শিল্প স্থাপন ও কৃষি উন্নয়নের দিকে নজর দেয়নি, বরং ভারতীয়দের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছে। [৩ তখন একজন ভারতবাসী হিসাবেঃ গান্ধীজী এদেশের কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের কথা ভেবেছেন, তখন বেসরকারী উদ্যোগে কৃষি উন্নয়নও সহজ ছিল না।

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচী কর্মহীন ও আধা-বেকারদের জন্য একটা আয়ের ব্যবস্থা করেছিল, অবসর সময়ে অনেকের বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দিয়েছিল ৪। গান্ধীজীর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যক্তিগত খরচ খরচার জন্য অপরের উপর নির্ভর করতে হত, ডাকাতি করারও প্রয়োজন দেখা দিত। কিন্তু গান্ধীজী চরকা ও খাদির মাধ্যমে ভারতের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সৈনিক ও তাদের পরিবারের একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশেষ সময় ও পরিস্থিতির কথা মনে রাখলে গান্ধীজীকে একজন বড় অর্থনীতিবিদ হিসাবে মেনে নেওয়া কঠিন নয়। সময়ের ব্যবধানে গান্ধীজী নিজেই অনেক পুরানো ধারণা বাতিল করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যে ভারীশিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন এবং তা যে রাষ্ট্রের মালিকানায় হবে, আচার্য নরেন্দ্র দেবকে লেখা চিঠি থেকে আমরা তা জানতে পারি।

কেবল ভারী ও বৃহৎশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে যে দেশের কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না, ভারতের মতো জনবহুল ও গরিব দেশে মূলধন-ভিত্তিক শিল্পের বদলে শ্রম-ভিত্তিক শিল্পে ও কৃষির উন্নতির মাধ্যমেই বেশী লোকের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেজন্য জাতিকে কায়িক শ্রম ও নতুন মূল্যবোধে অভ্যস্ত করা দরকার, এ-বিষয়ে এদেশে গান্ধীজীই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কোনো অ্যাকাডেমিক ইকনমিস্ট নন। অনুন্নত, গরিব অথচ উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার দেশে লোকের কর্মসংস্থান, মূলধন গঠন, শ্রম-ভিত্তিক

শিল্প প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিমী অর্থনৈতিক ধারণায় শিক্ষিত প্রথমে ডঃ দ্বারিক ঘোষ এবং তার কিছুদিন পরে ঠিক একই সময়ে দুই অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত ও র‍্যাগনার নার্কসে কয়েকটি ক্ষেত্রে অনেকটা গান্ধীজীর কাছাকাছি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ;

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সৃষ্টি, সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজিপাতিদের প্রভাব নষ্ট হয়, তখন তারা আর ইচ্ছা মতো অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অধ্যাপক গলব্রেথ মার্কিন দেশের অর্থনীতিকে একচেটিয়া ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে "কাউণ্টারভেলিং পাওয়ার" লক্ষ্য করেছিলেন গান্ধীজী সচেতনভাবে এদেশে সেই কাউণ্টারভেলিং পাওয়ার সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। দুঃখের বিষয়, গান্ধীবাদীদের বাইরে এদেশে একমাত্র সমাজতন্ত্রীরাই গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কম্যুনিস্ট অর্থনীতিবিদরা এদিকে একেবারেই দৃষ্টি দেননি। এম. এন. রায়ের নজরও পড়েছিল, তবে অনেক দেরিতে।

গ্রামের মধ্যেই কৃষির উন্নতি ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে গ্রামকে স্ব-নির্ভরশীল করার গান্ধীজীর ধারণা অবাস্তব বলে বামপন্থীরা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে গিয়েও অধ্যাপক অম্লান দত্ত অন্যত্র গ্রাম ও শহরকে পরস্পর-নির্ভরশীল করার কথা বলেছিলেন। কারণ তা না হলে কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের মাধ্যমে দেশে মূলধন গঠনের হার বাড়ানো যাবে না, গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে না। কিন্তু দুটি কম্যুনিস্ট দেশ—উত্তর ভিয়েতনাম ও চীন—গান্ধীজীর নাম একেবারেই ব্যবহার না করে তাঁর স্ব-নির্ভরশীল গ্রামের ধারণাকে কিছুটা বদলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে কার্যকর করতে চেয়েছে।

ভারীশিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়ে উত্তর ভিয়েতনাম ১৯৬০ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করে। ১৯৬৩ সালে লাও দং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের পর ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে যে নতুন পরিকল্পনা চালু করা হয়, তাতে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য ভারীশিল্পকে বাতিল করে ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এলাকা-ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে প্রতিটি এলাকাকে কৃষি-উৎপাদনে ও ক্ষুদ্রশিল্পে স্বাবলম্বী করার

চেষ্টা হয়। উত্তর ভিয়েতনাম ওই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন করতে পেরেছিল বলেই পরবর্তীকালে মারাত্মক রকম মার্কিনী বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। তবে গান্ধীজী শিল্পদ্রব্যে গ্রামকে স্ব-নির্ভরশীল করতে চেয়েছিলেন শহরের শোষণ বন্ধ করার জন্ত, আর উত্তর ভিয়েতনাম সাময়িকভাবে ওই কর্মসূচী নিয়েছিল যুদ্ধ-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে। গান্ধীজীর কাছে শহরাঞ্চল, শিল্পোন্নয়ন ও ধনতন্ত্র সমার্থক ছিল। তিনি দেখেছেন কী ভাবে গ্রামের সম্পদ শহরে চলে যায় এবং সেই সম্পদ শহরের বিলাসিতার মাধ্যমে অপচয় হয় এবং বিদেশী শিল্পপতি-ব্যবসায়ী জাতীয় শোষকদের মুনাফা হিসাবে দেশের বাইরে চলে যায়। ধনতন্ত্রের শোষণ বন্ধ করার জন্ত তিনি শহরের প্রসার ও শিল্পোন্নয়ন—দুটোই বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। ৫

এদেশে কয়েক বছর আগে মাও-এর ছবি ও বাণী সম্বল করে যাঁরা গান্ধীজীর সব চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও জানতেন কিনা সন্দেহ যে, খোদ চীনে স্বয়ং মাও সে-তুং রুশ ও পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে প্রবর্তিত অর্থনৈতিক উন্নতির পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে ১৯৫৬ সাল থেকেই অনেকটা গান্ধীজীর মতো কৃষিকে গুরুত্ব দিয়ে, আঞ্চলিক স্ব-নির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা বলে ১৯৫৬ সাল থেকেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে গান্ধীজীর পদ্ধতিতে চীনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন। "টেন গ্রেট রিলেশানশিপস" বইটিতে চেয়ারম্যান মাও তোতাপাখীর মতো ভারী শিল্পকে "মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু" হিসাবে উল্লেখ করেও বলেন, "হালকা শিল্প ও কৃষির বদলে ভারী শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে ভুল করেছে, আমরা তা এড়িয়ে গিয়েছি। ফলে বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই ওই সব দেশে জিনিসপত্তর পাওয়া যায়নি। আমাদের দেশে প্রচুর পণ্য পাওয়া গিয়েছে।···হালকা শিল্প ও কৃষির উপর অত্যধিক গুরুত্বের জন্ত এই দুটি ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে বেশী নজর দিতে হয়েছে।" ভারীশিল্পকে যারা অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি বলে মনে করতেন, গান্ধীজীর মতো চেয়ারম্যান মাও তাঁদের নিরাশ করেছেন। মজার ব্যাপার, এদেশে সোভিয়েত অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অম্লান দত্ত বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধে এবং ১৯৫৪ সালে বোম্বের ইকনমিক উইকলি পত্রিকায় অধ্যাপক মরিস ডবের সঙ্গে বিতর্কে যে-কথা বলেছিলেন, চেয়ারম্যান মাও-এর বক্তব্যে তাঁরই

প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মাও-এর মতে, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন যত বাড়বে, মূলধন সৃষ্টির পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষি অনেক বেশী এবং দ্রুত মূলধন গঠন করতে পারে। ৬ চীনে কোথাও "কমিউন", কোথাও এলাকা ভিত্তিতে কৃষি-পণ্য ও হালকা শিল্পে স্ব-নির্ভরশীল করার চেষ্টা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রের ক্ষমতা কমিয়ে মাও অঞ্চলের ক্ষমতা বাড়াতে বলেছিলেন। "অঞ্চলের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রতিবন্ধক।" গান্ধীজী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করে সারা দেশে গঠনমূলক কর্মসূচী কার্যকর করতে চেয়েছিলেন, চেয়ারম্যান মাও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য উপকূলের হালকা শিল্পগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন। চীনে উপকূলের শিল্পাঞ্চলে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে ক্যাডারদের সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরাট দেশের তুলনায় চীনে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল, পরিবহণ ব্যবস্থা আজও উন্নত নয়। তাই সড়ক নির্মাণে বা কৃষিকাজে মানুষের শ্রমশক্তিকে বেশী করে কাজে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি এলাকাতেই খাদ্যে ও হালকা শিল্পে স্ব-নির্ভরশীল করার উপর জোর দিতে হয়েছে। গান্ধীজীর মতো মাও নিজের দেশের বিশেষ সমস্যার কথা ভেবেই ওইসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। তবে চীনা সমাজে মেয়েদের বাইরের কায়িক শ্রমের কাজে অভ্যস্ত হওয়া এবং কম-খরচে শূকর পালনের সুযোগ ও চীনাদের খাদ্যাভ্যাসের জন্য চীনের একটা গ্রামকে যত সহজে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়,এই উপমহাদেশে বাইরের কাজকর্মে মেয়েদের ভূমিকা ও খাদ্যাভ্যাসের জন্য তা সম্ভব নয়।

[আনন্দবাজার পত্রিকা। ২ অকটোবর, ১৯৭৩।]

পাদটীকা

১. Amlan Datta: "Villageism" and Economic Development in Strategies for Economic Development. (Bombay).

২. J. Bandopadhaya: Social and Political Thought of Gandhi.

৩. দেশের শিল্পজাত দ্রব্য ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশে বিক্রি করার জন্য ইংরেজ-শাসকেরা ভারতীয়দের শিল্পস্থাপন করতে দিত না, এমন কী পূর্বাকলে ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে দেয়নি। ডঃ অমিয় বাগচী তাঁর "প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৯০০-১৯৩৯" গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইংরেজরা এদেশে বাগিচা ও রপ্তানি শিল্প গড়ে তুলেছিল নিজেদেরই মালিকানায় এবং বিদেশী ব্যাংকের ভারতীয় শাখাই ওই বাবদে ঋণ দিত।

৪. গরিব লোকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর এই কর্মসূচী সরকারী স্তরে কার্যকর করতে প্রথম উদ্যোগী হয় নেপালের রাণাশাহী। রাণাশাহী বরাবর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও নেপালের শাসক ও প্রধানমন্ত্রী ভীম শামসের নেপালে কুটিরশিল্প স্থাপন ও চরকার প্রচলন করার জন্য ১৯৩০ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে জনৈক তুলসী মেহেরকে সরকারী খরচে সবরমতী আশ্রমে চরকা ও কুটিরশিল্পে ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছিলেন। — Dr. Kanchonmoy Mazumdar : Nepal and the Indian National Movement. P. 54. and 59.

৫. "Nehru wants industrialization because he thinks that if it is socialised, it would be free from tbe evils of Capitalism. My own view is that the evils are inherent in industrialism, and no amount of socialization can eradicate them," Gandhiji in 1940. "Selections From Gandhi" by N. K. Bose. P. 93. Quoted by J. Bandopadhaya in "Mao Tse-Tung and Gandhi". P. 37.

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের মতো শহর সম্পর্কে গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনাও ভুল ছিল। হিন্দু সন্ন্যাসীরা যেমন শহর ও লোকালয় থেকে দূরে থাকার বাসনা পোষণ করেন, সেই হিন্দু সন্ন্যাসীদের চিন্তাধারাই কি এই দুটি ব্যাপারে গান্ধীজীর উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

৬. Jack Gray : "The Chinese Model. Some Characteristics of Maoist Policies for Social Change and Economic Growth" in Socialist Economics, edited by Alec Nove and D. M. Nuti.

পরিশিষ্ট—২

গান্ধী এবং মাও : সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

কয়েক বৎসর আগে এদেশে একদল যুবক চীনা কম্যুনিস্ট পারটির চেয়ারম্যান মাও-এর নাম করে গান্ধীজীকে কবর দিতে চেয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে গান্ধীজী এবং মাও, দুজনই অ-শ্বেতাঙ্গ এবং এশিয়ার দুটি জনবহুল দেশের রাজনৈতিক নেতা। একজনকে সম্মান দেওয়ার জন্য আর একজনকে বরবাদ করার চেষ্টা হলেও দুজনের চিন্তা-ভাবনা, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও দেশ-গঠনের ব্যাপারে দুজনের স্বকীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা তেমন হয়নি। ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মাও সে-তুং অ্যাণ্ড গান্ধী" সেই অভাব পূরণ করেছে এবং বইটিতে দুজন নেতার বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়েছে। একজন ভারতকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানী ছিলেন আর একজন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব এবং দেশী সামন্ততন্ত্র ও প্রাদেশিক সমর নায়কদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে গোটা দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। দুই নেতাই অর্থনৈতিক উন্নতির ইউরোপীয় পদ্ধতি পরিহার করে নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসারে স্ব স্ব দেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়, সেই দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হয় এবং স্বাধীনতালাভের সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যেই গান্ধীজী মারা যান। স্বাধীন ভারতে তাঁর দেশগঠনের কর্মসূচীগুলিও পরিত্যক্ত হয়। অপর দিকে, মাও কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর চীনের বাস্তব পরিস্থিতির কথা মনে রেখে তাঁর চিন্তাধারা পরিপূর্ণ রূপ দিতে পেরেছেন এবং সেজন্য প্রয়োজন অনুসারে দেশের অনেক রাষ্ট্রশক্তিব্যবহারকারীকে প্রশাসন থেকে সরিয়েও দিয়েছেন। চীনা সমাজের ভিত্তি প্রধানত ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ায়, মাও-এর

পক্ষে চীনে রাজনৈতিক কর্মসূচী অনুসারে কাজ করা অনেক বেশী সহজ ছিল। ভারতের হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাববৃদ্ধির চেষ্টা এবং হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা নিয়ে গান্ধীজীকে এত বেশী ব্যস্ত এবং মাঝে মাঝে বিব্রত থাকতে হত যে, তিনি দেশগঠনের অর্থ নৈতিক কর্মসূচী রচনার ব্যাপারে তত মনোযোগ দিতে পারেন নি। অনেক কর্মসূচী তাঁকে রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথা ভেবে তৈরি করতে হয়েছে। এখানে গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ভারতের নয়টি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাচনী কর্মসূচী কার্যকর করা নিয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মুশকিলে পড়েন। কারণ নির্বাচনী ইস্তাহারে একই সঙ্গে মাদকদ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কথা বলা ছিল। মাদকদ্রব্য বর্জন করলে সরকারের রাজস্ব কমে যাবে আর অপর দিকে শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই গান্ধীজী সেবাগ্রামে কংগ্রেসী শিক্ষাবিদদের ডেকে তাঁর কর্মভিত্তিক শিক্ষা-ভাবনা ব্যক্ত করেন, পরে ডঃ জাকির হোসেন কমিটী সেই শিক্ষা-ভাবনাকে শিক্ষা-পদ্ধতির রূপ দেন, যাতে বিদ্যালয়ের আয়ে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া যায়, গরিব ছাত্রেরা তাদের পড়াশুনার খরচ নিজেরা উপার্জন করতে পারে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই গান্ধীজী সম্পর্কে একটা ভুল-ধারণা দূর করেছেন। হিন্দ স্বরাজের বক্তব্য অনুসারে গান্ধীজী কিন্তু শেষ পর্যন্ত যন্ত্র-সভ্যতা ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের বিরোধী ছিলেন না। তিনি শিল্প ও শহরকে মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করলেও শেষ পর্যন্ত কিছু বৃহৎ শিল্পকে মেনে নিয়েছিলেন এবং ওই সব শিল্পের মালিকানা যে রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত, এবং শিল্প-পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের অধিকারও স্বীকার করেছিলেন, ১৯৪০ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ রচিত কর্মসূচী অনুমোদনের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। মাও কিন্তু পুরোপুরি আধুনিক যুগের মানুষ এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের সাহায্যে চীনদেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছেন। অন্য দিকে গান্ধীজী মানুষকে সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু ধরেছেন, সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বিবেচনাবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, মাও-এর মতো নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কোন কিছু জনসাধারণের উপরে চাপিয়ে দিতে চাননি। গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময় বিজ্ঞান-ভিত্তিক না হলেও তিনি উদারনীতিকদের মতো মনুষ্যত্বের বিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন,

যদিও তাঁর প্রস্তাবিত সমাজব্যবস্থা মনুষ্যত্বের বাধাহীন বিকাশের পক্ষে পুরোপুরি সহায়ক ছিল না।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই নেতার শিক্ষা সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যেও মিল খুঁজে পেয়েছেন। দুই নেতাই কায়িক শ্রমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষাকে উৎপাদন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণের শর্ত হিসাবে দুজনেই বয়স্কদের সাক্ষর করার উপর জোর দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে বয়স্ক-শিক্ষা একেবারেই উপেক্ষিত, স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেও এক বিরাট সংখ্যক শিশু ও কিশোর-কিশোরী নিরক্ষর থেকেই যুবা ও বয়স্ক হচ্ছে, চীন কিন্তু নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে এখন একেবারেই মুক্ত। চীনকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং পার্টির একাধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক-অধ্যাপকদের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত হতে না দেওয়ার জন্য মাও সে-তুং যে-ভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছেন, গান্ধীজী প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তার মিল কম। দুজনেই শিক্ষাকে কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে কোন মিল নেই। গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজ ছিল শহর ও বৃহৎ শিল্পের প্রাধান্যহীন স্বল্প কারিগরি বিদ্যার ভিত্তিতে চালিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। আর মাও চেয়েছিলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালিত এক নতুন অর্থনীতি ও সমাজ। ফলে মাও পরিচালিত চীনে কারিগরি-শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে মানব সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাকে একটা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখা হয়।

মাও এবং গান্ধীজীর রাজনৈতিক আন্দোলনের পৃথক পদ্ধতি দুই দেশের রাজনৈতিক ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে নিহিত। চীনের অরাজক অবস্থার মধ্যে প্রভাব বিস্তার বা প্রভাব বজায় রাখতে হলে সশস্ত্র সেনাবাহিনী গঠন না করে উপায় ছিল না। জনসমর্থন-লাভে সক্ষম সশস্ত্র সেনাবাহিনীই চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ বা মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব চীনে মাও-পরিচালিত বিপ্লবে কোন ভূমিকাই নেয়নি। সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার পথ নেয়নি বলে চীনের

একদা গণতন্ত্র-বিশ্বাসীরা একদিকে সামন্ততন্ত্র ও সামরিক গোষ্ঠী পরিচালিত কুয়োমিন্টাং সরকার এবং অপর দিকে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করতে গিয়ে একেবারেই দাঁড়াতে পারেনি। চীনের গ্রামাঞ্চলে এক রকমের অরাজকতা বিরাজ করায়, গ্রামবাসীদের দলে রাখতে হলেও তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সশস্ত্র দল মোতায়েন না করে কোনো উপায় ছিল না। অপর দিকে ভারতে ইংরেজ-শাসনে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না। অরাজকতাপূর্ণ দেশে শত্রু পক্ষকে সাবাড় করার দরকার হয়, ভারতে তার কোনও দরকার ছিল না—গান্ধীজী অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বিপক্ষকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতে, সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তি শেষ পর্যন্ত অন্যায়কে প্রতিহত করতে পারে। তিনি হত্যার রাজনীতিকে একেবারেই এড়িয়ে গিয়েছেন। কারণ হত্যার রাজনীতি বিরোধী মতামতকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় না, জীবিত থেকে কারও মতামত পরিবর্তনের সুযোগ দেয় না এবং বিরোধী মতামত শুনে নিজের চিন্তা-ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে চীনে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে, সে-সবের বিরুদ্ধে নিজেদের ভাবনা-চিন্তা অনুযায়ী সমালোচনা বা আন্দোলন করার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই, সমালোচনা করতে হবে উপরের কারও না কারও নির্দেশ অনুসারে, কখনও বা মাও-এর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের বিরুদ্ধে মাও-এর আদর্শ রক্ষার নামে। মাও-সে-তুং চীনে ঈশ্বরের স্থান নিয়েছেন।

চীনে কম্যুনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা! আরও কোনও শাসক গোটা চীন জাতিকে এইভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, এইভাবে গোটা জাতির মধ্যে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ঘটনার কোনো নজিরও ইতিহাসে মিলবে না। ডঃ বন্দোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, চীনে কম্যুনিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পুরো কৃতিত্ব কি মাও-এর মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা অনুসারে কাজের জন্য? না, এ-ব্যাপারে মাও পুরো কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। জার্মানী আক্রমণে পর্যুদস্ত ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কুয়োমিন্টাং সরকার, দেশে অরাজক অবস্থা ও প্রদেশের সামরিক কর্তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অবহেলা করা, অর্থ নৈতিক দুর্গতি, উৎপাদন হ্রাস, বন্দর-শহরগুলিতে একাধিক বিদেশী রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত এলাকা এবং মারাত্মক রকম মুদ্রাস্ফীতি

কুয়োমিন্টাং সরকারের পতনের প্রধান কারণ। অর্থাৎ চালু সরকারকে ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে, এমন একটা অবস্থা যুদ্ধের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। দৃঢ়ভাবে, ধৈর্য ধরে ওই সরকারকে ধাক্কা দেওয়ার মতো রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অভাব ছিল। মাও-এর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি সেই অভাব পূরণ করে। এ-ব্যাপারে কিন্তু মাও চীনা কৃষকদের সংগ্রামী এবং বার বার বিদ্রোহ করার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মারকিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে কুয়োমিন্টাং সরকারকে সবরকম সাহায্য করা সত্ত্বেও ওই সরকারের উপর মারকিন সরকার একেবারেই নির্ভর করতে পারেনি, প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাই শেকের বাহিনী যাতে কম্যুনিস্ট-বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নামে, সেজন্য দরবার করতে মারকিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ালেসকে চুংকিং যেতে হয়েছিল। জাপানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে কম্যুনিস্ট সেনাবাহিনীকে যুক্ত করতে চাওয়ার অপরাধে মারকিন সরকার জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে ১৯৪৪ সালের অকটোবরে চীন থেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। জেনারেল চু-তের পরিচালনায় যে কম্যুনিস্ট সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করে তা বিভিন্ন যুদ্ধে জয়ী হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সুশিক্ষিত সং ও দক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে মাও টি´কে ছিলেন বলেই তাঁরই হাতে চীনের শাসনভার এসেছিল। চীনের বিশেষ ধরনের পরিবেশ ও সংগ্রামের জন্য সেনাবাহিনী সব সময়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছে ও করে থাকে। ফলে মাঝে মাঝে পিপলস লিবারেশান আর্মি আর কমুনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর লিন পিয়াও-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী কার্যত পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করত, এখনও বিভিন্ন প্রদেশে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বই সবচেয়ে বেশী। চৌ-এন-লাইয়ের মৃত্যুর পর তেঙ যে প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না, তার কারণ সেনাবাহিনী তার বিরোধী-গ্রুপকে মদত দেয়, কিন্তু খোদ মাও-পন্থীদের প্রধানমন্ত্রী করতে চায়নি, তাই প্রধানমন্ত্রী হলেন মাও-পন্থীদের সমর্থনপুষ্ট অথচ তাদের দলের লোক নয় এমন এক ব্যক্তি—হুয়া কুয়ো-ফেং।

অনগ্রসর দেশ থেকে চীনের বর্তমান অবস্থায় উত্তরণের জন্য মার্কসীয় দর্শন, সশস্ত্র বিপ্লবের মতবাদ বা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে লেখক কৃতিত্ব দিতে রাজী নন। তাঁর মতে, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, উৎপাদন বৃদ্ধির সীমাহীন সম্ভাবনার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব, ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরোধিতা,

নিজেদের ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে বঞ্চিত মানুষদের মনে অতিরিক্ত বিশ্বাস উৎপাদন ও তাদের ভূমিকাকে যথাযথ মূল্য দেওয়া এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার পরিবর্তন অপেক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর মাও-এর গুরুত্ব আরোপ চীনে মাও-এর সাফল্যের প্রধানতম কারণ।

[এই প্রবন্ধের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ইতিপূর্বে অন্যত্র ছাপা হয়েছিল।]

পরিশিষ্ট (৩)

কয়েকটি চিঠি

কলকাতার সমস্যা

শ্রীনিরঞ্জন হালদারের লেখা "কলকাতার সমস্যা ও তার সমাধান" সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা সর্বভারতীয় নগরী। লেখক যে বলেছেন, এদেশের শতকরা ৪২ ভাগ রপ্তানি ও ২৫ ভাগ আমদানি কলকাতা বন্দর দিয়ে হয়, তাতেই এই শহরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। এখানেই কলকাতা শহরের সঙ্গে বিহারের রাজধানী পাটনা, উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনৌ, বা মহীশূরের রাজধানী বাঙালোরের পার্থক্য। এই জন্যই সব প্রাদেশিক রাজধানী বাদ দিয়ে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রকে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের চিন্তা করতে হয়। যে-শহর সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র, তাতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মানুষের ভিড় হবেই। সুতরাং কলকাতার সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে অবাঙ্গালীর উপস্থিতি বা উপার্জন প্রসঙ্গ না তোলাই সঙ্গত। তারা আসবে এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা আরও বেশী সংখ্যায় আসবে—এটা ধরে নিয়েই এই সর্বভারতীয় মহানগরীর উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে হবে।

তাছাড়া আসাম, বিহার, ওড়িশা বা উত্তরপ্রদেশের যত লোক কলকাতায় বা তার পার্শ্ববর্তী শিল্প এলাকাগুলিতে বাস করে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী বাঙালী বাস করে ঐসব রাজ্যগুলিতে। শিলং, গৌহাটি, কটক, পাটনা, লখনৌ, এলাহাবাদ, কাশী, নাগপুরের বহু এলাকা ঘুরলে মনেই হয় না যে, বাংলা দেশের বাইরে কোথায় এসেছি। তবে পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীর কাজ পাওয়ার দাবি নিশ্চয়ই স্বীকার্য এবং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার এমন একটা নির্দেশ অবশ্যই জারি করতে পারেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সব শিল্পে অন্তত অর্ধেক কাজ বাঙালীর জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

কলকাতা এক দরিদ্র দেশের বড় শহর। সুতরাং তার সর্বত্র ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি বা সুপরিকল্পনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা নয়। তারপর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশ বিভাগ এ শহরের যে ক্ষতি করেছে তার তুলনা নেই। লেখক যে পশ্চিমবঙ্গের অত্যধিক কলকাতা-নির্ভরতার কথা বলেছেন, তাও বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। কলকাতা শহরের উপর থেকে জনতার ভিড় অবশ্যই কমাতে হবে। তার জন্য যেমন জেলা-শহরগুলিকে শিল্প-সমৃদ্ধ ও কর্মচঞ্চল করা দরকার, তেমনই দরকার শিল্পসমৃদ্ধ আসানসোল ও চা-বাগিচার কর্মকেন্দ্র শিলিগুড়িকে সুপরিকল্পিত বৃহৎ নগরীরূপে গড়ে তোলা। পুনা গড়ে উঠেছে বলে বোম্বাই হতশ্রী হতে পারেনি।—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-১৬।

॥ ২ ॥

শ্রীনিরঞ্জন হালদার লিখিত "কলকাতার সমস্যা ও তার সমাধান" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লুম। প্রবন্ধটির শেষ পর্যায়ে মন্তব্য মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখেনি। তাছাড়া ওগুলো বহুলাংশে অনুমান-ভিত্তিক।

আর্নেস্টো চে গুয়েভারার কিউবা ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ পর্যন্ত সঠিক হদিশ দিতে পারেনি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য গুয়েভারাকে কিউবা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল—এর সপক্ষে লেখক কোনো তথ্যগত প্রমাণ দিতে পারবেন কি?

পেঙ্গুইন এশিয়া, আফ্রিকা, ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে ধ্বংসাত্মক কাজে প্ররোচনা দেবার জন্য হো কিংবা মাওয়ের জীবনী শস্তা দরে বিক্রি করছে—এটাকে লেখকের নিজস্ব মত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। লেখকের এই ধারণার ভিত্তি বোধহয় অরওয়েল সাহেবের ১৯৪৩ সালের লেখা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের আন্দোলন বিস্তার লাভ করুক—এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য হতে পারে না।

মনে হচ্ছে, লেখকের বক্তব্য হল, পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক হিংসাত্মক

কার্যকলাপের অন্যতম কারণ হচ্ছে পেঙ্গুইনের বই। লেখককে একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই : পাড়ায় পাড়ায় ছোরা, বোমা, পাইপগান নিয়ে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, পেঙ্গুইনের বইয়ের তারা পাঠক নয়। তারা কোনো বই পড়ে না। —অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ দস্তিদার কলিকাতা-২৬।

[দেশ (আলোচনা) ১ শ্রাবণ, ১৩৭৮ (১৯৭১)]

॥ ৩ ॥

নিরঞ্জন হালদারের "কলকাতার সমস্যা ও তার সমাধান" প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে কলকাতার সমস্যাগুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে লেখকের "কয়েকটি" প্রস্তাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। লেখক প্রায় ৪ হাজার একর জমিতে পচা ডোবা ইত্যাদি আছে বলেছেন এবং সেগুলি ভরাট করে সেখানে নতুন বাড়ি তৈরি করার পিছনে অন্তরায়ের কথা লিখেছেন। কিন্তু আইন করে সরকার বা কর্পোরেশান সে জায়গাগুলো অন্তত ভরাট করতে পারেন এবং তাতে যে খোলা জায়গার পরিমাণ বাড়বে ও মশামাছির উপদ্রব কমবে, সেকথা উল্লেখ করেননি। লেখক সবসময় পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন নতুন স্কাইস্ক্রাপার তৈরির কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু সেটা যে কতটা খরচা সাপেক্ষ সেকথা চিন্তা করেননি। বরং শহরে যে-সব বড় বড় বাড়ি আছে, তার ওপরে আরও একটা তলা অনায়াসে বাড়ানো যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করালেই এটা বোঝা যাবে। ওপরের তলা ৯ ফুট উঁচু করলেই যথেষ্ট হবে এবং hollow brick, light weight বা prestresed conerete or tarfelt দিয়ে তৈরি করলে বাড়ির ওপরে বেশী ওজনও চাপবে না। এতে বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার ভয় নেই, কম খরচাসাপেক্ষ ও দ্রুত রূপায়ণ সম্ভব। সরকারী বাসভবনগুলোর ওপরে এটা প্রথম করে শহরের অন্যান্য বাড়ির মালিকদের আকৃষ্ট করা যেতে পারে। এছাড়া শহরে বহু পুরানো বাড়ি আছে, যা এত বড় যে বাড়ির মালিকরা সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছেন না। সেগুলো সরকার ভাড়া নিয়ে সামান্য রদবদল করে বহু self contained ফ্ল্যাট তৈরি করতে পারেন। কিছুদিন আগে কলকাতা পুলিসের এক বাড়ি ভাড়া নেওয়ার বিজ্ঞাপনের উত্তরে এরূপ বহু বাড়ির হদিস পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই রকম একটা বাড়ি নিয়ে তাতে প্রায় তিরিশটি দুই কামরার

ফ্ল্যাট করার পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। এইসব প্রচেষ্টা রূপায়িত করলে প্রায় ১৫% ফ্ল্যাটবাড়ি এক বছরের মধ্যেই বাড়ানো সম্ভব হবে এবং তা খুব কম খরচে হতে পারে। পরে ধীরে ধীরে দশ-বারো তলা বাড়ি তৈরি করা যেতে পারে। লেখক বাসের বদলে ছোট ছোট স্কুটার ইত্যাদির কথা চিন্তা করেছেন। একটা বাস যেখানে প্রায় ৮০।১০০ জন যাত্রী বহন করে, সেখানে ঐ বাসের বদলে অন্তত ১০টি ছোট গাড়ি দরকার হবে। তাতে কি কলকাতার রাস্তার উপর অযথা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে না? বরং কয়েকটি জায়গায় ফ্লাইওভার এবং অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা থেকে ট্রাম তুলে নিলে যানবাহন চলাচল দ্রুততর হবে। এটা অবশ্য সি-এম-ডি-এর পরিকল্পনার মধ্যেই আছে। অফিসগুলো ডালহৌসি-কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করলেই বাস-ট্রামের সমস্যা অনেকটা কমে যাবে। পরিশেষে লেখক কী করে পাতাল রেল নস্যাৎ করে দিলেন, তা বোঝা গেল না। পাতাল-রেল যখন অন্য যানবাহন চলাচলকে ব্যাহত না করে নতুন বাড়তি পরিবহণের জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন এতে আমাদের ক্ষতি তো হচ্ছে না। সুতরাং এটা হতে বাধা কোথায়? যত দেরিই হোক না কেন?—অরুণকুমার ভট্টাচার্য, নিউ আলিপুর।

[দেশ, ২৮ জুলাই, ১৯৭১]

॥ ৪ ॥

"কলকাতার সমস্যা ও তার সমাধান" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশের (২৬জুন, ১৯৭১) পর শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়, অপূর্বকৃষ্ণ দস্তিদার এবং শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য আমার বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। শ্রীভট্টাচার্য তাঁর চিঠিতে (৪ জুলাই) মহানগরীর প্রায় ৯ হাজার একর জমি পচা ডোবা ভরাট করে এবং সেখানে বাড়ি তৈরি এবং বর্তমানে যে-সব বাড়ি আছে তার উপর আর কিছু তলা তুলে গৃহসমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করেছেন। আমার প্রবন্ধে "আরবান রিনিউয়াল" স্কীম বলতে ডোবা ভরাট করাও বোঝানো হয়েছিল। এখন বর্তমানে বস্তি রেখে নতুন ভরাট করা এলাকায় বাড়ি তুললে গৃহসমস্যার সমাধান হবে না, বরং ময়লা জল নিকাশ, আবর্জনা অপসারণ, পরিবহণ প্রভৃতি সমস্যা আরও শোচনীয় আকার ধারণ করবে, নাগরিকদের বেড়াবার এবং

যুবক ও শিশুদের খেলাধূলার জন্ত ফাঁকা জায়গাও বাড়ানো যাবে না। তাছাড়া শহরের মধ্যে বস্তি ও বস্তি-এলাকা রাখলে পৌরসভার আয় প্রতি বছরই কমে যাবে। এক একটা এলাকা ধরে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে একই সঙ্গে বহুতলায় বাড়ি তৈরি করা দরকার। জীবনবীমা সংস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকেও টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এই শহরে এই জাতীয় কোনো পরিকল্পনা না থাকায় ওই টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া বাড়ি তৈরি চলতে থাকলে মহানগরীর অবস্থা আরও শোচনীয় আকার ধারণ করবে। "কলকাতার রাস্তার উপর চাপ পড়বে," এই যুক্তিতে শ্রীভট্টাচার্য বাসের বদলে স্কুটার চালানোর প্রস্তাবেও আপত্তি করেছেন। কলকাতা শহরে এখনও ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, হাতে-টানা ও সাইকেল রিকশা চলে। টেম্পোর সংখ্যাও প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। স্কুটার চালু করে বরং রিকশাকে তুলে দেওয়া যেতে পারে, যা আমেদাবাদে করা হয়েছে। তাছাড়া স্কুটার চালু হলে দিল্লির মতো এখানেও ট্যাকসিওয়ালাদের হাতে যাত্রীদের হয়রানি কমবে।

আমি কলকাতায় পাতাল-রেলের বিরোধী নই। কিন্তু এই গরিব রাজ্যে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য বছরে ৫০ লক্ষ টাকাও খরচ করা সম্ভব হয় না, সাড়ে চার কোটি টাকার জন্য নিম্ন-দামোদরে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজ আটকে থাকে, টাকার অভাবে আমহার্স্ট স্ট্রীটকে ধর্মতলা স্ট্রীটের সঙ্গে মেশানো যাচ্ছে না, গ্রামাঞ্চলের রাস্তা মেরামত বন্ধ থাকে, সে-রাজ্যে ১৪০ কোটি টাকা পাতাল রেলের বদলে অন্যান্য জরুরী প্রকল্পে খরচ করা উচিত।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমিও এক মত যে, ভারতের সর্বপ্রধান শহরে অন্য রাজ্যের লোক আসবে। অথচ বড় শহর বলেই ভিন্ন রাজ্য বা রাজ্যের ভিন্ন এলাকা থেকে কলকাতায় ভিড় করার হার কমানো দরকার। প্রতিবেশী রাজ্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ হলে কলকাতায় নতুন কর্মপ্রার্থীর ভিড় কমতে পারে। ওড়িশার উন্নতির জন্য অনেক কাজেই এখন আর আগের মতো ওড়িয়াদের পাওয়া যায় না। বোম্বাইও সর্বভারতীয় শহর। কিন্তু সেখানে শ্রমিকশ্রেণী রাজ্যের লোক হওয়ায় তাদের উপার্জিত অর্থ মহারাষ্ট্রের গ্রামে চলে যায় এবং রাজ্যের মধ্যে আয়ের মালটিপ্লায়ার এফেক্ট ফলতে দেখা যায়। বৃহত্তর কলিকাতায় এই এলাকার অধিবাসী, ভিন্ন

রাজ্যের লোক ও উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের ফলে গ্রামাঞ্চলের চাষী পরিবারের নতুন শিক্ষিত ছাত্রেরা কাজ পাচ্ছে না। তাই কোথাও তারা নকশালপন্থী আন্দোলনে শামিল হচ্ছে, কোথাও মুসলিম লীগ বা ঝাড়খণ্ড দল মারফৎ চাকুরি সংরক্ষণের দাবি করছে।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ দস্তিদার তাঁর ছোট্ট চিঠিতে অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। পৃথিবীর সব ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষমতা মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিউবাতে কোনো রকম স্বাধীন আলোচনার সুযোগ না থাকায় ওই দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করেই ধারণা করতে হয়। এ-ব্যাপারে ১৯৭০ সালের ২৬ জুলাই বিপ্লবের ১৭ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে হাভানায় ফিডেল কাস্ট্রোর বক্তৃতা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন: "The enemy will say our difficulties are growing and he will be right; the enemy will say we have problems of inefficiency and he will be right; and the enemy will say there is discontent, and he will be right, and he will say there are frictions, and he will be right and we have no fear of admitting it." মজার ব্যাপার, কিউবাতে কাস্ট্রো ছাড়া এ-সব কথা আর কারও বলার অধিকার নেই এবং একমাত্র কাস্ট্রোই এ-কথা নির্ভয়ে স্বীকার করতে পারেন। কিউবার অর্থনীতির অবনতির জন্য তিনি চারটি কারণ নির্দেশ করেছিলেন:

1. Trained as a lawyer before becoming a guerilla chieftain, he was "ignorant" in economic affairs. So was the rest of the revolutionary leadership.

2. An exodus of managerial and technical personnel since 1959 revolution had not been adequately replaced.

3. Cuba has faced the United States in open political hostilities since 1960 and Cuba has created the best equipped military and security apparatus in Latin America. Cuba is spending about 1·2 billion a year on education, public health and social security combined. This is a great burden on the economy.

4. Cuban population has grown from 6·8 million in 1958 to 8·2 million in 1970 despite the departure of 500,000 Cubans into exile. The increased population is made up 60 per cent of persons, mainly school age children, who do not produce.

অর্থনীতির ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বিপ্লবীদের মধ্যে গুয়েভারার হাতেই কিউবার অর্থনীতির দায়িত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী দিন। ১৯৫৯ সালের অকটোবরে গুয়েভারা শিল্পদপ্তরের ভার নেন, পরে জাতীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হন এবং তারপর শিল্পমন্ত্রী হন। ১৯৬৪ সালের শেষ থেকে কিউবাকে রাতারাতি আখ থেকে বহুপণ্যের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে গুয়েভারা যে মোট কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসের কারণ হয়েছিলেন, সে-কথা শ্রীঘোষ দস্তিদারের মনে থাকতে পারে। শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য কাস্ট্রো গুয়েভারাকে অর্থনীতি পুনর্গঠনের দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলে গুয়েভারা কি সম্মানের সঙ্গে কিউবাতে বাস করতে পারতেন? তার চেয়ে বিপ্লবী হয়ে অন্যত্র প্রাণ দেওয়া কি বেশী সম্মানজনক নয়?

আবার, গুয়েভারার মতো একজন বিদেশীকে কিউবা সরকার বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করাকে কাস্ট্রোর উদারতা বলে চালানো উচিত নয়। কাস্ট্রো দেশের মধ্যে তেমন কাউকে বিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ কোনো কিউবান সরকার বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হলে দেশের মধ্যে তার প্রতিপত্তি ও প্রভাব বাড়তে পারে, সেটা কাস্ট্রোর পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ারই কথা।

আমি আমার প্রবন্ধে বলেছিলাম যে, "আন্দামানে, দেউলি ও অন্যান্য জেলে অতি সহজেই মার্কসবাদের বই পাওয়া যেত, বন্দীরা অন্য ধরণের বই সহজে পেতেন না।" এর পরেও শ্রী ঘোষ দস্তিদারের কী করে মনে হল যে, অরওয়েলের রচনাই আমার ধারণার ভিত্তি? অরওয়েলের লেখা প্রমাণ করল অন্য দেশেও ধনতান্ত্রিকেরা প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য কম্যুনিস্টদের সাহায্য করে থাকে। যেমন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য গরম গরম বিপ্লবের বাণী উচ্চারণকারী ও কম্যুনিস্টদের আশ্রয়দাতা মওলানা ভাসানীকে মদৎ দিয়েছিলেন, তাঁকে পাকিস্তানের সরকারী প্রতিনিধি দলের নেতা করে চীনে পাঠিয়েছিলেন।

ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পর্কে বইয়ের সংখ্যা ও প্রকৃতি দেখেই পেঙ্গুইন সংস্থার উদ্দেশ্য বোঝা যেতে পারে। এরা অনগ্রসর দেশের ডেমোক্র্যাট নেতা বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাক্তন কম্যুনিস্ট দিকপাল মানবেন্দ্রনাথ রায়, জর্জ প্যাডমোর, ভান মালাক্কা বা ফিলিপিনের হুক-বিদ্রোহের নেতা লুই তারুকের কোনো জীবনী ছাপেনি। অন্য ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কেও কোনো বই ছাপছে না। অনগ্রসর দেশগুলিতে ধ্বংসাত্মক কাজ চলতে থাকলে এইসব দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে এবং রপ্তানির ব্যাপারে শিল্পোন্নত দেশগুলিকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে।

"পাড়ায় পাড়ায় ছোরা, বোমা, পাইপগান নিয়ে যারা সন্ত্রাস" সৃষ্টি করে, তারা পেঙ্গুইনের বই না পড়লেও তাদের চালকেরা যে পড়ে, তাঁদের লেখা পড়লেই তা বোঝা যায়। ওদের জন্যে যারা বাংলা বই লেখেন, তাঁরা পেঙ্গুইনের বই থেকেই মাল-মসলা সংগ্রহ করেন। কলকাতায় গত চার বছরে ৮০ খানিরও বেশী ধ্বংসাত্মক-সাহিত্য বিষয়ে বাংলা বই বেরিয়েছে। এই সঙ্গে যাত্রা ও থিয়েটারের নাটক তো আছেই। এজন্য কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে সুস্থ মানসিকতা ফিরিয়ে আনতে হলে পেঙ্গুইন বা ধ্বংসাত্মক সাহিত্যের ভূমিকা স্বীকার করা প্রয়োজন।—**নিরঞ্জন হালদার,** **কলকাতা-৬২।**